# সাহিত্য-বার্ষিকী

[ শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত মাসিক অধিবেশন
পূর্ণিমা সম্মিলন ও অন্যান্য সভায় পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং
পরিষদের ১৯শ বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ ]

দুর্গাসপ্তমী, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৪২

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদ,
পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া।

# নিবেদন

শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের "সাহিত্য-বার্ষিকী" গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। পরিষদের ১৯শ বর্ষের মাসিক ও অন্যান্য অধিবেশন গুলির পঠিত প্রবন্ধ কবিতাদির কয়েকটি এবং উক্ত বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ ইহাতে প্রকাশ করা গেল। প্রবন্ধ কবিতাদির মধ্যে কয়েকটি নবীন লেখকের লেখাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সব লেখকগণকে সাহিত্য-চর্চ্চা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা—পরিষদের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সুতরাং ইহাদের রচনার মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকিলেও সহৃদয় পাঠকবর্গকে তাহা ক্ষমা করিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি। সাহিত্য সাধনার দিক দিয়া শান্তিপুরের খ্যাতি নূতন নহে। সেই অতীত-গৌরবমণ্ডিত দেশের সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানটির এই সামান্য দানটুকু, আশা করি দেশবাসী সাদরে গ্রহণ করিবেন

প্রকাশক

## —সূচী—

"মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাঙ্গলা ভাষা,
তোমার নামে তোমার গানে
কতই শান্তি ভালবাসা ;
কি যাদু বাঙ্গলা গানে
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।"

# স্বর্ণজিৎ বার্ষিকী

## বোধন

### ( গান )

নিখিল ধরণী শান্ত সুন্দর, মাধুরী মাখান' গান।
পুলকে উদিছে স্নিগ্ধ সবিতা, হাসিভরা সব প্রাণ।
জাগে শতদলে প্রভাত হিল্লোলে,
অপরাজিতায় শিউলি বকুলে,
বোধন-বিভাসে অলিকুল ভাসে
প্রাণ পেল' নব দান।

কাননে কামিনী জানায় প্রণতি,
শাখে সুখে পাখী করিছে আরতি,
অপরূপ শোভা অতি মনোলোভা,
আনন্দের অধিষ্ঠান।

অশিবে নাশিতে আসিছে শিবানী,
পলাইল দূরে তিমিরা রজনী,
জাগো পুরবাসী, ওঠ মা ভগিনী,
দুখ হ'ল অবসান।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

# লুকোচুরি

"হে কৃষ্ণ, শুনিছি তুমি খেলায় মুগ্ধ করো এবং সবাইকে তোমার খেলার সাথী ক'রে নেও। শুনিছি তুমি এককালে পৃথিবীর এক স্থানে জন্মে, তোমার মোহন রূপ দেখিয়ে, তোমার মধুর বাঁশী বাজিয়ে, নানা মন-ভোলান' খেলা খেলে, সেখানকার লোকজনকে কিছুদিন ধরে অবিরাম আনন্দ-স্রোতে ভাসিয়ে রেখেছিলে। তুমি তো তারপর আর কোনো স্থানে তোমার নয়ন-রঞ্জন রূপ দেখাওনি, খেলাও খেলোনি। লোকে বলে ভালবাসা ও আনন্দই তোমার স্বরূপ—তোমার দেশ, কাল, পাত্র নাই—সকলকেই তুমি সমান ভালবাসো। তবে কেন তোমার এমন অবিচার? তুমি একটা সময়ের প্রতি, একটা স্থানের প্রতি কেন এতো পক্ষপাত দেখালে, আর অন্যান্য সময়কে, অন্যান্য দেশকে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত ক'রলে?"

"প্রিয় সখে, আমি তো সব সময়েই ও সব স্থানেই তোমার এবং আর আর সকলের মধ্যে ও চারিদিকে খেলে বেড়াচ্ছি। চেতন অচেতন যা কিছু, সবই তো আমার চিরদিনের খেলার সাথী। আমি সব সময়ে অসংখ্য স্থানে অসংখ্য প্রকারের লীলা ক'রে সকলকে আমার দিকে টান্‌বার চেষ্টা করি। তোমার সঙ্গেও খেলা করি। তুমি আমাকে দেখতে পেয়েও দেখতে পাও না—বুঝতে পেরেও বুঝতে পারো না। এ যে আমাদের লুকোচুরি খেলা। তোমার চোখ বাঁধা—আমি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাই, তুমি ধ'র্‌তে পারো না। কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে জানান্ দিয়ে যাই, ভাই।"

"হে সুন্দর, তোমার মধুমাখা কথা শুনে যে আনন্দে আমার বুক

ভরে যাচ্ছে—আমার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হ'চ্ছে। কিন্তু তোমার কথাগুলি বেশ স্পষ্ট নয়—বেশ তলিয়ে বোঝা যাচ্ছে না—কিছু রহস্যময় ঠেক্‌ছে। হে প্রিয়তম, আমার ভিতরে ও বাহিরে তোমার যে খেলার কথা বল্‌ছো, তা একটু ভাল করে বলো না।"

"এখন, ভাই, লুকোচুরি খেলাই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। এই লুকোচুরি খেলা অনেক দিন থেকে খেলে খেলে, এতে ভাই, আমি ভারি পটু হইছি—কেউ আমায় ধ'রতে পারে না। আমি যে কত জায়গায় গিয়ে লুকুই, তা তুমি বুঝতেই পারো না।"

"আমি কখনো চাঁদের মধ্যে গিয়ে লুকুই। ঐ পূর্ণচন্দ্রকে আর ঐ জ্যোৎস্না-মণ্ডিত ধরাতলকে দেখে কি বুঝতে পারো না যে, আমি ওদের মধ্যে আছি?"

"অন্ধকার রাত্রিতে যখন তুমি আকাশের দিকে মুখ তুলে নানা আকারে সাজানো অসংখ্য ঝক্‌ঝকে তারার বিন্যাস দেখে আনন্দে ভাসতে থাকো, তখন তুমি বুঝ্‌তে পারো না যে, আমি তাদের মধ্যে লুকিয়ে আছি।"

"খুব ভোরের বেলা উঠে প্রকৃতি দেবী তাঁর ঘরের পূবের দেওয়াল-খানি সিঁদুর গোলা দিয়ে নিকিয়ে দেন। আমি যে তার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকি, তা তুমি বুঝ্‌তে পারো না।"

"যখন আকাশটা ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায়, তখন তা দেখে কি বুঝতে পারো না যে, আমি তার মধ্যে আছি? আমার সন্ধান দেবার জন্যে আমি আমার সোণালী রঙের পীঠবস্ত্রখানি মাঝে মাঝে উড়িয়ে দিই। তুমি তা বুঝ্‌তে না পেরে, তাকে বিদ্যুৎ বলে ভাবো।"

"সেবার তুমি দার্জ্জিলিঙে উত্তর আকাশের গায়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার বিরাট ধবল মূর্ত্তির উপর বাল-সূর্য্যের কিরণপাত দেখে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত

হয়েছিলে। সে সময়ে আমি সেখানে গিয়ে লুকিয়েছিলাম, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পেরেছিলে?"

"আর একবার তুমি পুরীতে গিয়ে একদিন বিকেলে বেলাভূমিতে ব'সে অনন্ত নীল বারিধিতে ঢেউয়ের পর ঢেউ দেখ্‌তে দেখ্‌তে এত আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিলে যে, রাত্রি হ'য়ে গেল, তবু তোমার চোখ ফেরাতে পারো নি। সে শোভার মধ্যে যে আমি ছিলাম, তা কি তুমি জান্‌তে পেরেছিলে?"

"কাল বিকেলে বিচিত্র বর্ণের যে অর্দ্ধ গোলাকার রামধনু উঠেছিল, তার মধ্যে যে আমি ছিলাম, তা তো তুমি বুঝতে পারো নি। তোমাকে ঠকাবার জন্যেই তো আমি নানা জায়গায় লুকুই।"

"আমি আরো কত জায়গায় লুকুই তা তুমি জানো না। ঐ যে সুন্দর বড বড় গোলাপ ফুল দেখছো, এবং তাদের গন্ধে তোমার প্রাণ মাতোয়ারা হ'য়ে উঠছে; আমিই যে ওদের মধ্যে লুকিয়ে আছি।"

"হরিণের ঢুলু ঢুলু চক্ষু ও পল্লবিত শৃঙ্গের মধ্যে আমি। গজেন্দ্রের মধ্যে আমি লুকিয়ে থেকে তার সুন্দর মন্থর গতি উৎপন্ন করি।"

"যখন জোর বাতাসে সবুজ শস্য ক্ষেত্রের পৃষ্ঠে ঢেউ খেলে, তখন আমি সেখানে। বসন্ত সমাগমে যখন গাছ নূতন সবুজ পাতায় ঢেকে যায় এবং পলাশের ও অশোকের লাল ফুলের বিকাশে বন উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, এবং বিটপিস্থ বিহঙ্গকুল মধুর তানে দিগন্তকে মুখর ক'রে তোলে, তখন জান্‌বে যে আমি সেখানে আছি।"

"একদিন গরম বাতাসে তোমার গা ঝল্‌সে যাচ্ছিলো। তা দেখে আমি থাক্‌তে না পেরে, তোমায় মৃদুমন্দ সুশীতল সমীরণ স্পর্শ করিয়ে তোমার গা জুড়িয়ে দিয়ে গেলাম, তাতেও কি তুমি বুঝতে পারো নি যে আমি এসেছিলাম? তুমি আমার সঙ্গে খেলায় কি হাত ঠকে যাও, আমায় চিনতে পারো না।"

"যেখানে লতাসকল তাদের মৃদু আবেষ্টনীর দ্বারা প্রকাণ্ড গাছকে জড়িয়ে ধ'রে মনোহর শীতল নিভৃত নিকুঞ্জ নির্ম্মাণ করে, সেখানে গিয়ে আমি লুকুই। যেখানে পাহাড়ের গা বেয়ে কুলুকুলু রবে ঝরণা বেরুচ্ছে, সেখানে আমি লুকুই। যেখানে মেঘ দেখে নানা বর্ণোজ্জ্বল বিচিত্র পুচ্ছ মেলিয়ে ময়ুর নাচতে থাকে, সেই নাচের মধ্যে আমি থাকি। আমি যেখানেই লুকুই, সেখান থেকে একটা সাড়া দিই, তুমি তা বুঝতে না পেরে খেলায় হেরে যাও।"

"যখন তোমার একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে, বা যখন তুমি একটা বড় উদ্যমে অসফল হ'য়েছো, বা যখন তোমার কোনো প্রিয় আত্মীয়ের বিয়োগ হ'য়েছে—এইরূপ সংসারের কোনো না কোনো নিষ্পেষণে তুমি একেবারে মুষড়ে গিয়ে আমাদের খেলার কথা একেবারে ভুলে গেছ, তখন তোমার পত্নী এসে তোমার শিশু পুত্রটিকে তোমার কোলে দিয়ে গেলেন। নির্ভরশীল সরল, স্নেহের পুতুলীটি তোমার কোলে শুয়ে, তার চারটি দাঁত বা'র ক'রে, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো এবং হাত পা ছুড়তে লাগলো। আমি তখন তোমার শিশুর আকারে তোমাকে আমাদের খেলার কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছিলাম। এত মর্ম্মপীড়ার মধ্যেও শিশুকে দেখে তোমার মুখে হাসির রেখা দেখা দিলে এবং হৃদয়ের অনেক ভার স'রে গেলো। আমিই তোমাকে আশা দিয়ে উৎসাহিত করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সঙ্কেত বোঝোনি—তুমি আমাকে দেখতে পেলে না। আমি মুচকে হেসে পাশ দিয়ে চ'লে গেলাম, তুমি টের পেলে না।"

"একদিন তুমি বিকালে বেড়াতে বেরিয়ে দেখতে পেলে যে, বেলা অবসান-প্রায়। এক কুলিরমণী সারা দিনের পরিশ্রমের পর শ্রান্তদেহে রাস্তা দিয়ে তার কুটিরে ফিরে যাচ্ছে, মাথায় একটা বোঝা আর পিঠে বুকের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা একটী পুঁটুলী। মাঝে মাঝে তার ঐ

পুঁটুলীর কথা মনে পড়ছে, আর এতো ক্লেশ সত্ত্বেও সে আনন্দে গুন্‌গুন্ ক'রে গান ধ'রে দিচ্ছে। পুঁটুলীটিতে কি আছে? যা আছে, সে যে তার নয়ন-মণি, সর্ব্বস্ব ধন, তার আনন্দের উৎস, যা নিয়ে সে সারা দিনের খাটুনীকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রেছে, যার স্পর্শে তার সর্ব্ব শরীরে তড়িৎ প্রবাহিত হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে কি তোমারো শরীরে তড়িৎ ছুটে যায় নি? এই জাজ্জ্বল্যমান মাতৃস্নেহের মধ্যে আমি আছি, তা কি তুমি বুঝতে পারো নি? আমার দোষ নাই। আমি তোমাকে অনাদি অনন্ত লুকোচুরি খেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ টিপে হেসে স'রে পড়েছিলাম।"

"মনে পড়ে, একদিন তুমি তোমার ছ' বছরের ছেলেকে অঙ্ক শেখাতে বসেছিলে? তুমি তাকে একটি অঙ্ক দিতে আরম্ভ করলে—তুমি বল্লে, 'একজন লোক তার তিনটি ছাগলের ছানা দেড় টাকায় বেচলে—।' তুমি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলে, কিন্তু তার আগেই তোমার ছেলে ব'লে উঠলো,—'বাবা, সে লোকটা সত্যি সত্যি ছাগল-ছানাগুলোকে বেচে ফেল্লে? সে তো বড় নির্দ্দয়. সেই সুন্দর ছানাগুলো থাকলে কেমন ঘাড় বেঁকিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলতো! সে লোকটা দেড়টা টাকার জন্যে কেন সেই ছানাগুলোকে বেচলে বাবা?' যখন বালকটি এই কথাগুলি বলছিলো তখন তুমি তার নির্ভরশীল উজ্জ্বল মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে। বালকের মুখে তার সরলতার, কোমলতার, পরদুঃখকাতরতার ছবি দেখে তুমি বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলে। তোমার শিশু পুত্রের মুখের সেই ভাব পরে কত দিন তোমার মনে উদিত হ'য়েছে এবং মানুষের কুটিলতার কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। বন্ধু, তুমি বুঝতে পারোনি যে, আমিই তোমার ছেলের মনে ঐ ভাব এনে এবং তাকে দিয়ে ঐ কথাগুলি বলিয়ে, আমাদের চিরকালের খেলার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ অনুভব

করেছিলে এবং কিছু স্ফূর্তিও পেয়েছিলে, কিন্তু আমাকে ধ'র্‌তে পারোনি। আমি হেসে, হাততালি দিয়ে চ'লে গিয়েছিলাম।"

"আমি তোমার কাছে যাই, তুমি ফ্যল ফ্যাল ক'রে তাকাও এবং অবাক হ'য়ে ভাবো 'এ কি ব্যাপার!' আমি ভাই তোমাকে বিষয়-চিন্তা থেকে নিবৃত্ত ক'রবার জন্যে আমাদের চিরন্তন খেলার একটি ক্ষীণ আভাস দিই। এর বেশী তো আর কিছু করা যায় না। তুমি যদি আমাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে আমাকে ধ'রে ফেলো, তা হ'লে লুকোচুরি খেলার মজা যে চলে যায়। সখে, আমি তোমার কাছে অনেক কথা ব'লে ফেলেছি, বেশী ব'ল্লে আমি ধরা প'ড়ে যাবো। তাহ'লে খেলার মজা থাকবে না। আমি যতো ঢাকা থাক্‌বো, ততোই আমাদের খেলার মাধুর্য্য বাড়বে। আমি তোমার অতি নিকটে থেকেও ধরা দেবো না।"

"হে প্রিয় হইতেও প্রিয়, আমি তোমার কথায় এখন বুঝতে পার্‌ছি যে, তুমি আমাকে অনেক বার তোমার খেলার কথা মনে ক'রে দিয়েছো এবং আমার মনে চিন্তা জাগিয়ে দিয়েছো। কিন্তু আমি তোমাকে কেবলই ভুলে গিয়ে পথ ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছি। হে প্রাণের বন্ধু, আমাকে ব'লে দাও, আমি তোমাকে কেমন ক'রে খুঁজবো, যাতে ক'রে খেলায় আমার ভুল না হয়?"

"প্রিয়তম, আমি তোমার চারি ধারে সর্ব্বদা খেলে বেড়াচ্ছি। অতএব সব জায়গাতেই তুমি আমার সন্ধান পাবে। যেখানে লোভ ও স্বার্থপরতা, সেখানেই অজ্ঞান, অত্যাচার, প্রবঞ্চনা ও দুঃখ ভোগ। জেনো যে, আমাদের খেলা ভুলে যাওয়াতেই এই দারুণ অধঃপতন এসে প'ড়েছে। যেখানে যেখানে এইরূপ দুরাচার দেখতে পাবে, সেখানে সেখানেই আমাদের খেলার কথা মনে করে দিয়ে সকলকে জাগিয়ে দিতে হবে। যারা বিপথে গিয়েছে, তাদের আমাদের খেলায় টেনে আনতে হবে। এই

ক'রতে ক'রতে, তুমি আমার খুব কাছে পৌঁছতে পারবে, এবং তোমার আমার মধ্যে যে পর্দ্দা প'ড়ে গেছে, তা সরে যাবে। তখন তোমার ও জগতের সঙ্গে আমাদের চিরদিনের খেলার সব দৃশ্যগুলি সামনে এসে প'ড়বে। সবাইকে ভালবাসতে হবে, সকলের সেবা করতে হবে। তা হলেই আমার নিকট পৌঁছতে পারবে; খোলাখুলি খেলা চলবে, চোখ বাঁধতে হবে না।"

"হে প্রিয় সখা, লোকে বলে, তোমাকে পেতে হ'লে অনেক ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়তে হয়, নিভৃত স্থানে বাস ক'রতে হয়, তোমার ধ্যান ক'রতে হয়, অনেক ভজন সাধন ক'রতে হয়, ছাপা তিলক কাটতে হয়, যার তার সঙ্গে মিশতে নেই, সাধু সঙ্গ করতে হয়। হে প্রাণপ্রিয়, তোমার খেলায় যেতে হ'লে কি এসব না ক'রলে চলে না?"

"সখে, গোড়ায় এই সাধনগুলির দরকার হ'তে পারে, কিন্তু পরে যারা আমার নিত্যলীলা দেখতে চায়, তাদের এ সব জিনিষের প্রয়োজন নাই। সদাচার ও আমার নাম স্মরণের অভ্যাস ক'রো, কিন্তু সেই সঙ্গে নিরন্তর আমাকে খুঁজতে হবে। আমাকে খুঁজে বার করাটাই আসল কাজ। যে সকল জীব আমার নিত্য সহচর, আমার সেই সব খেলার সাথীদের সঙ্গী হতে হ'বে। চোখ বেঁধে খেলেও আনন্দ অধিক পাবে। আমাকে তোমার চারিদিকে ও প্রকৃতির সর্ব্বত্র পাবে। আমি এক সময়েই অনেক জায়গায় লুকুতে পারি।"

"আমি ভীতিবিহ্বল, স্ফূর্ত্তিহীন, হতাশ, রোগগ্রস্ত, ক্ষুধিত, যাতনাগ্রস্ত, কোটি কোটি প্রাণীর মধ্যে খেলতে ভালবাসি। যারা তাদের ভালবাসে, উৎসাহিত করে, দুঃখ মোচন করে, খেলায় টানে, তারা আমার বড় প্রিয়। তারা অনন্তকাল আমার সঙ্গে খেলবে। ধনী, বিত্তসঞ্চয়ী, বিদ্যাভিমানী, উচ্চকুলসম্ভূত ব্যক্তিরা আমার খেলা ভুলে গেছে। কণ্টকাকীর্ণ পথ থেকে তাদের উদ্ধার ক'রে আমার খেলায় ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি জানি,

তাদের মন থেকে আমাদের চিরদিনের খেলার কথা একেবারে মুছে যায়নি। সস্নেহে, নির্ব্বন্ধ সহকারে তাদের খেলায় ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।”

‘বন্ধু, অনেক কথা বলা হ’য়েছে, আর কথায় কাজ নেই। এসো, আমরা আবার খেলা আরম্ভ করি। আমরা নিরন্তর খেল্‌বো, তা হ’লে তুমি আমাকে পক্ষপাতী বল্‌তে পার্‌বে না…।”

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম্‌-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন।

---

# বাংলার চিনিশিল্প

আমাদের এই শান্তিপুরে বহুদিন পূর্ব্বে দেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুতের অনেকগুলি কারখানা ছিল, আর এই সমস্ত কারখানা হইতেই সারা বাংলাদেশে চিনি সরবরাহ করা হইত। এই ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থাগমের পথ সুপ্রশস্ত ছিল এবং বহু লোক প্রতিপালিত হইয়া আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এখন আর সেদিন নাই, ঐ ব্যবসায় লুপ্তপ্রায় হওয়ায় দেশের অনেক ধনী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অন্ন সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে আধুনিক প্রথায় পাঁচটি চিনির কারখানা তৈয়ারী হইয়াছে, অথচ আমরা এ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যে চিনি নিত্য প্রয়োজন, তাহার বেশীর ভাগই বিদেশ হইতে ও বাংলার বাহির হইতে আসিয়া আমাদের অভাব মোচন করিতেছে।

একটু সেকালের কথা আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বে একমাত্র বাংলাদেশ হইতেই বছরে গড়ে ৬০।৬৫ হাজার টন চিনি পাঞ্জাবের

ভিতর দিয়া তাতার, পারস্য ও রুষিয়ায় রপ্তানি হইত। এক সময়ে কলিকাতাতেই চিনি তৈয়ারী করার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইত, Steam Engine, Vacuum Pan ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে ইংলণ্ড অপেক্ষা খরচ বেশী পড়িত ; যন্ত্র তৈয়ারি করিবার জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছিল।

সেকালে দিনাজপুর এবং যশোহর জেলা গুড় ও চিনি তৈয়ারীর জন্য বিখ্যাত ছিল। দিনাজপুর আখ হইতে গুড় তৈয়ারী করিত এবং যশোহরের অধিকাংশ গুড়ই খেজুরের রস হইতে প্রস্তুত হইত। একমাত্র দিনাজপুর জেলাতেই সাড়ে চার লক্ষ টাকার আখ জন্মিত। সে সময়ে বাদলাগাছির চিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ফুলওয়ারির চিনি মধ্যম এবং ঘোড়াঘাটের চিনি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত ছিল। উত্তর দিনাজপুর অপেক্ষা দক্ষিণ দিনাজপুরে অধিক পরিমাণে আখ জন্মিত, এখানে আখের জমিতে গোবর, পুকুরের পাঁক ও খোলের সার দেওয়ার প্রথা ছিল। প্রতি বিঘাতে ১৬৮ মন আখ জন্মিত, এবং তাহা হইতে ১৪ মণ গুড় তৈয়ারী হইত। প্রতি কাঁচি মণ ১৷৷০ দরে বিক্রয় হইত, আর এক মণ গুড় হইতে দশ সের চিনি পাওয়া যাইত। দিনাজপুরে বৎসরে গড়ে সওয়া দুলক্ষ হন্দর গুড় তৈয়ারী হইত, আর ঐ গুড় তৈয়ারী করিতে বহু লোক কাজ পাইত ; ঐ গুড়ের সিকি পরিমাণ চিনি প্রস্তুত হইত। গড়ে আট টাকা হন্দর দরে চিনি বিক্রয় করিয়া একমাত্র দিনাজপুরবাসীই বছরে প্রায় ৪৫০০০০৲ টাকা পাইত। বাংলা দেশ গড়ে বছরে যাট হাজার টন চিনি বিদেশে পাঠাইত, আর এই চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য মোট নয় লক্ষ লোক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এই দিনাজপুরের চিনির কিয়দংশ East India Company খরিদ করিত, বাকীটা মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় চালান হইত। এই সময়েই শান্তিপুরের সুত্রগড় অঞ্চল এই চিনির ব্যবসায়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুর চিনির কারখানা এই সময়ে দেশীয় নিকৃষ্ট চিনি এবং জাভার ৩ নং চিনি খরিদ করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে আধ হইতে এক ইঞ্চি পর্য্যন্ত দানাদার চিনি প্রস্তুত করিত এবং উহা দুই টাকা হইতে দুই টাকা চারি আনা মূল্যে পাউণ্ড বিক্রয় হইত। আভ্যন্তরিণ গোলযোগের ফলে এই কারখানা বন্ধ হইয়া যায় ও তদানিন্তন দেশীয় চিনিশিল্পের প্রভূত পরিমাণ ক্ষতি হয়।

অনেক দিন হইতে ভারতবর্ষে Begg Sutherland, Andrew Yule প্রভৃতি কোম্পানী চিনির কারখানা চালাইয়া আসিতেছে, ভারত-বাসী চালিত বড় কারখানা সেকালে ছিল না বলিলেও হয়।

বিগত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ভারতবর্ষে আমদানী চিনির উপর হন্দর প্রতি নয় টাকা এক আনা শুল্ক ধার্য্য হয়, এবং এই শুল্ক, মধ্যে সামান্য একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি বিরাট শর্করা-শিল্প ভারতে গড়িয়া উঠিল; বিশেষ পরিতাপের বিষয়, বাংলা কিন্তু সকলের পিছনেই পড়িয়া রহিল।

এই বৎসরে বাংলা দেশে মাত্র পাঁচটি মাঝারি কারখানা কাজ করিয়াছে, কিন্তু এই বাংলা দেশ ব্যতীত সমস্ত ভারতবর্ষে ১৩৮টি কারখানা চিনি প্রস্তুত করিয়াছে: বাংলায় বছরে প্রায় সাড়ে তিন হইতে চার লক্ষ টন চিনি কাটতি হয়, ইহার আনুমানিক মূল্য আট কোটী টাকা ধরা যাইতে পারে। এই টাকাটা বিভিন্ন দেশের লোকেরা ভোগ করিতেছে আর আমরা হা-অন্ন হা-অন্ন বলিয়া কেবল কাঁদিয়াই মরিতেছি।

আমাদের দেশের চাহিদা অনুযায়ী হিসাব করিলে দেখা যায়, আরও পঞ্চান্নটি চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করিলে ঐ অভাব দূর হইতে পারে। ঐ পঞ্চান্নটি কারখানা নিয়মিত চালাইতে হইলে প্রতি কারখানার জন্য

গড়ে দৈনিক চারশত টন আখের প্রয়োজন হইবে। এই আখের চাষ ও কলের শ্রমিকের দ্বারা অনেকাংশে বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বাংলাদেশকে অনেক দিন হইতেই ভিন্ন প্রদেশগুলি আর্থিক বিষয়ে শোষণ আরম্ভ করিয়াছে এবং আজও বাংলা সকলের পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দেখা যায়—

১৯৩২-৩৩ হইতে ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের চিনি প্রস্তুত, প্রয়োজন ও বিদেশ হইতে আমদানীর হিসাব—

| | ১৯৩২-৩৩ | ১৯৩৩-৩৪ | ১৯৩৪-৩৫ | ১৯৩৫-৩৬ | ১৯৩৬-৩৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| কেবলমাত্র আখের রস হইতে চিনি প্রস্তুত | ...৪৭৮১২০টন | ৬৪৫০০০ | ৭৭৯০০০ | ৮৮৭০০০ | ১০০৭০০০ |
| ভারতে চিনির আবশ্যক হইয়াছে | ৮৯৫২৮০টন | ৮০০০০০ | ৯০০০০০ | ৯০০০০০ | ৯০০০০০ |
| বাহির হইতে আমদানী হইয়াছে | ...৪১৭১৬০টন | ২৩৫০০০ | ১২১০০০ | ১৩০০০ | ১০৭০০০ |

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, আগামী ১৯৩৬-৩৭ সালে এক লক্ষ সাত হাজার টন চিনি বেশী উৎপন্ন হইবে। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া চিনির কারখানার মালিকেরা মিলিতভাবে Governmentএর নিকট একটি আপত্তি জানাইয়াছেন এই যে, ভবিষ্যতে আর যেন কোন কারখানা স্থাপনে অনুমতি না দেওয়া হয়। এইজন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার বিপক্ষে বলিয়াছেন,—একমাত্র বাংলা দেশই বছরে ৪ লক্ষ টন্ চিনি খরিদ করে, সে চাহিদা মিটাইবার পক্ষে কয়েকটি কারখানা পর্য্যাপ্ত নহে,

এখানে আরও অনেক মিল বসাইবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে' বাঙ্গালী বাংলার চিনিই ব্যবহার করিবে, অন্য প্রদেশকে ধনী হইবার সুযোগ দেওয়া তাহার সম্মানের পরিপন্থী।

বর্ত্তমান বৎসরে বাংলা দেশে মাত্র পাঁচটি উন্নত ধরণের চিনির কারখানা কাজ করিয়াছে—

১। দেশবন্ধু সুগার মিলস্ লিমিটেড্—চরসিন্দুর, ঢাকা।

২। রাধাকৃষ্ণ সুগার ওয়ার্কস্—বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

৩। বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিমিটেড্—গোপালপুর, রাজসাহী।

৪। সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্—সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

৫। মডেল সুগার মিলস্—হরিনারায়ণপুর, নদীয়া।

ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ সালে কয়টি কারখানা আখ ও গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার হিসাব—

| সাল | কয়টি কারখানা আখ হইতে চিনি করিয়াছে | চিনির পরিমাণ —টন— | কয়টি কারখানা গুড় হইতে চিনি করিয়াছে | চিনির পরিমাণ —টন— | কারখানা বৃদ্ধির গতি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯২৬-২৭ | ২৫ | ৬২৯৪১ | ২২ | ৫৪০৮৫ | ৪৭ |
| ২৭-২৮ | ২৬ | ৬৭৬৮৪ | ১৯ | ৫২০৫৫ | ৪৫ |
| ২৮-২৯ | ২৪ | ৬৮০৫০ | ১৪ | ৩১০৩৮ | ৩৮ |
| ২৯-৩০ | ২৭ | ৮৯৭৬৮ | ১১ | ২১১৫০ | ৩৮ |
| ৩০-৩১ | ২৯ | ১১৯৮৫৯ | ১০ | ৩১৭৯১ | ৩৯ |
| ৩১-৩২ | ৩২ | ১৫৮৫৮১ | ১৭ | ৬৯৫৩৯ | ৪৬ |
| ৩২-৩৩ | ৫৭ | ২৯০১৭৭ | ২৭ | ৮০১০৬ | ৮৪ |
| ৩৩-৩৪ | ... | ... | ... | ... | ১৪৩ |

বিগত ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষে কলকব্জা আমদানী হইয়াছে ১০,১৪,৪৪৯৲ টাকার এবং ১৯৩২-৩৩ সালে হইয়াছে ১,৫৩,১১,১২৬৲ টাকার। ১৯৩৩-৩৪ সালে ছাপ্পান্নটি চিনির কারখানার জন্য সমুদয়

কলকব্জা বিদেশ হইতেই আমদানী হইয়াছিল। কেবলমাত্র দুইটি কারখানার জন্য বয়লার, ইঞ্জিন ও ইলেক্‌ট্রিকের সরঞ্জাম বাদে অন্যান্য জিনিসপত্র কলিকাতাতেই তৈয়ারী হইয়াছিল।

গভর্ণমেণ্ট-রিপোর্টে দেখা যায় ১৯৩৩-৩৪ সালে মোট ২,৫৬,৬০০ একর জমীতে এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে ২,৭৬২০০ একর জমীতে আখের চাষ করা হইয়াছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে ৪৫৭২০০ টন গুড় তৈয়ারী হইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে ৪৯২১০০ টন গুড় তৈয়ারী হইবে। তারপর, খেজুর রসে, তালের রসে ও অন্য প্রকারে ১৯৩৩-৩৪ সালে তৈয়ারী হইয়াছে ৯৯,৯০০ টন, এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে হইবে ৯৯,৮০০ টন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ১৯৩৩-৩৪ সালে মোট গুড় তৈয়ারী হইয়াছে ৫,৫৭,১০০ টন এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে গুড় তৈয়ারী হইবে ৫,৯১,৯০০ টন।

এইবার দেখা যাউক আমরা দেশীপ্রথায় কি করিয়া চিনি তৈয়ারী করি। বাজার হইতে গুড় কিনিয়া যে খাঁড়টুকু পাই, তাহাই পেতেতে ঢালিয়া দিয়া শেওলা চাপাইয়া ( clarification করিয়া ) মাত্‌-গুড় বাহির করিয়া লই, ইহাই ১নং চিনি। এই মাত্‌-গুড় আবার গালাইয়া গুড় তৈয়ারী করি, পরে আবার পেতেতে ঢালিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে চিনি হয়, তাহাই ২নং চিনি। আবার ঐ পরিত্যক্ত মাত্‌-গুড় হইতে যে চিনি পাওয়া যায়, তাহাই ৩নং চিনি নামে কথিত হইয়া থাকে। শেষে পরিত্যক্ত মাত্‌-গুড়ই কোতরা নামে অভিহিত হয় এবং ঐ কোতরাই তামাক তৈয়ারীর কাজে ও গরুর পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, এই পুরাতন প্রথায় চিনি তৈয়ারী করিলে সমস্ত চিনি গুড় হইতে ধরিয়া লওয়া যায় না, কারণ খোলা কড়াইতে জ্বাল দিলে চিনির ভাগ কমিয়া যায়, এবং তাপ বেশী পাওয়ায় অনেক পুড়িয়াও নষ্ট হয়। এই হিসাবে যথেষ্ট লোকসান সহ্য করিতে হয়, অপর দিকে সময় ও মজুরিতেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এখন আধুনিক প্রক্রিয়ার দিকে যদি দৃষ্টিপাত

করি তাহা হইলে দেখিতে পাই, পুরাতন প্রথায় এক মণ চিনি তৈয়ারী করিতে যে সময় লাগে, অধুনাতন উপায়ে সেই সময়ে বহু মণ চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

এই বেকার সমস্যার যুগে ঐ শিল্পকে বাঁচাইতে পারিলে অনেকের অন্নসংস্থান হইতে পারে; বেশী মূলধন অর্থাৎ ১০।১২ লক্ষ টাকা লইয়া কাজ করিতে পারিলে লাভবান হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ছোট আকারে করিলে লাভ হওয়া কঠিন বলিয়াই মনে হয়। তবে গৃহশিল্প হিসাবে ইহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে কতকটা লাভবান হওয়া যায়। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, বাংলার চাহিদা কত, সেই জন্যই কুটির শিল্পের প্রসারে দেশের ও দশের কল্যাণ হইতে পারে। যদিও এই সমস্ত কারখানায় উৎকৃষ্ট সাদা চিনি প্রস্তুত হইবে না, কিন্তু ইহাতে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, গরীব ভারতবাসী লাল চিনিই বেশীর ভাগ খরিদ করে, ১নং সাদা চিনির তত পক্ষপাতী নহে।

বর্ত্তমানে এই শান্তিপুরেই ১০,০০০ হাজার গৃহস্থের বাস, লোকসংখ্যা ২৭,০০০ হাজার। প্রতি গৃহস্থ যদি বছরে ১০ সের চিনি ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা হইলে ১০,০০০ × ১০ = ১,০০,০০০ সের = ২,৫০০ মণ চিনির দরকার হয়। আর বছরে যদি গড়ে ৫ সের ধরা যায়, তাহা হইলে ১০,০০০ × ৫ = ৫০ ০০০ সের ১,২৫০ মণ চিনি লাগে। কম পক্ষে ইহা প্রয়োজন হইয়া থাকেই। কুটির শিল্প হিসাবে এই কাজ আরম্ভ করিলে ঐ অভাব মিটাইতে পারা যায়।

এখন আমরা যদি চিনির কারখানার বর্ত্তমানের উপযুক্ত সমস্ত কলকব্জা বাদ দিয়া কেবলমাত্র দেশী প্রথায় ( Open Pan Systemএ ) Centrifugal Engine power দ্বারা কুটির শিল্প হিসাবে চালাই, তাহা হইলে ১,২৫০ মণ চিনি সরবরাহ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না,

আর ইহাতে কতকগুলি লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাও হইতে পারে। প্রথমে—১টা ইলেক্‌ট্রিক্ মোটর বা তৈল চালিত ইঞ্জিন, ৪টা সেণ্ট্রিফিউগ্যাল মেসিন, ১টা ক্রিষ্টালাইজার, ১টা পগ্‌মিল এবং পুলি, স্থাপ্ট্‌, ট্যাঙ্ক্‌, কড়াই ইত্যাদি আবশ্যক। ইহার আনুমানিক মূল্য ৫০০০৲ টাকা। তার পর প্রতিমাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব—

ব্যয়—

প্রতি মাসে গুড় ১৬০০ মণ, দর ৩।৶০ হিঃ ৫৫০০৲ টাকা।

ঐ গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার
জন্য মজুরি, কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্য,
বস্তা ইত্যাদি ৫০০৲ টাকা।

মোট ৬০০০৲ টাকা।

আয়—

১৬০০ মণ গুড় হইতে ৮০০ মণ চিনি,
দর ৮৲ হিঃ ৬৪০০৲ টাকা।
৮০০ মণ কোতড়া, দর ১৲ হিঃ———৮০০৲ টাকা।

৭২০০৲ টাকা।
ব্যয় বাদ ৬০০০৲ টাকা।

বাকী লাভ ১২০০৲ টাকা।

মাসে ঐ ১২০০৲ টাকা নেট্ লাভ পাওয়া যাইতে পারে। যদি বৎসরে ছয় মাসও কাজ চালান যায় তাহা হইলে ১২০০৲ × ৬ = ৭২০০৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। বড় আকারের কারখানা করিলেই Manufacturing tax, Excise duty চিনির উপর চাপে, কিন্তু ছোট আকারে অর্থাৎ ২০ জনের মধ্যে লোক লইয়া ঐ প্রকার ইঞ্জিন-শক্তির দ্বারা

চালাইতে পারিলে, কারখানা-আইনে বাধা পায় না, এবং হন্দর প্রতি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা Excise taxও দিতে হয় না। এখন এ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে চাই মূলধন। বর্ত্তমানে দেশের যা আবহাওয়া, তাহাতে মনে হয় ধনিকের অনুকম্পায় ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। চাই সমবেত সহানুভূতি—সকলের মূলধন। আমাদের এই শান্তিপুরের দশ হাজার গৃহস্থ ১০৲ টাকা হিসাবে অংশ খরিদ করিলে ১,০০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ৫৲ হিসাবে ধরিলেও ৫০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়। প্রথমে এই টাকাতেই আমরা কাজ আরম্ভ করিতে পারি। দেশের সুধীজনের এইদিকে অবহিত হওয়ার সময় আসিয়াছে, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে ভবিষ্যতের আশার আলোক একেবারেই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে।

শ্রীঈশানচন্দ্র সরকার।

---

# শারদোৎসব

সাঁঝের আঁধার নামেনি তখনো কালো বনরেখা ঘিরে,
গোধূলি-রাগের শেষ আভাটুকু সবে ঝিকিমিকি করে।
অস্তবেলার ম্লান হাসিটুকু তখনো ধরণী গায়
জড়ায়ে রয়েছে—মাধবী বিতানে ঝরা ফুলরাশি-প্রায়।

আকাশের কোণে সন্ধ্যার তারা দূরে করে জ্বল্ জ্বল্,
পাখীরা তখন ফিরিছে কুলায়, ঘরে ফেরে গাভীদল ;

জোছনা-হসিত শারদ নিশীথ প্রীতি কমনীয় মুখে
দাঁড়াল আসিয়া অজানা লগনে নিরালা সাঝের বুকে !

কিংশুকবন ঘন শাখা পরে পথভোলা কোন পিক্,
ছন্দিত সুরে কুহু ঝঙ্কারে মুরছিল চারিদিক !
দখিণা বাতাস পরশে আনিল আনন্দ জাগরণ,
হেনার গন্ধে ভেসে এল মৃদু সুখ-স্মৃতি-শিহরণ।

কুন্দ পাঠাল উপহার তার—জোছনা প্লাবন সাথে,
বেলকুঁড়িদল ফুটিয়া উঠিল স্নিগ্ধ শিশির পাতে।
কুমুদ-কোরক নব অনুরাগে পাঠাল প্রণতি তার,
রজনীগন্ধা-আধফোটা-কলি সাজাল অর্ঘ্যভার !

বনে বনে আজি চলে আয়োজন উৎসব-ক্ষ'ণ তরে,
তরুমর্ম্মরে জাগে সে বারতা মদির মলয় ভরে ;
কালো ঝাউবীথি উৎসব রাতে মুখরে বাঁশরী সুরে
নদী-কলতান অস্ফুটগানে তটেরে মুখরি ফেরে !

নীলিম আকাশে উৎসব আজি কনক প্রদীপ জ্বলে,
দূর নদীচরে, কাশবন পরে উৎসব মালা ঝলে ;
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগে শিহরণ বিকচ কোরক-বুকে
অজানা পুলক স্পন্দন আজি ধরণীর বুকে, মুখে !

ক্ষীরোদ সাগরে বহুদিন পরে জাগে উৎসব লেখা,
নীল জলভার উছসিয়া ফেরে শুভ্র সিকতা রেখা ;
আসে কল্যাণী বিশ্বজননী কনককিরণ-রথে
আসে চঞ্চলা চপলা কমলা স্বর্ণঝাঁপিটি হাতে।

শাখাতলে ঝরা কামিনীর বুকে পদরেখা তার জাগে !
জাগে আগমনী অশোক-পরাগে করবী-রক্তরাগে ।
দ্যুলোক হইতে কৌমুদী ঝরে, সারা বনপথ ভাসে ;
জোছনা-সিক্ত ছায়াবীথি-পথে শারদলক্ষ্মী আসে !

শ্রীগৌরচন্দ্র পাল ।

---

# ঠাকুর হরিদাস

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনেকদিন পূর্ব্বে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধিকালে ইনি শ্রীভগবানের নাম রসাস্বাদন দ্বারা মানবের কল্যাণ ও পরিত্রাণের জন্য নগরে নগরে সেই সুধানাম ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গলাদেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। তৎকালে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং নবদ্বীপধামে শ্রীবাস আচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধকগণ দেশের ধর্ম্মসম্পর্কে অধোগতি দেখিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন এবং পাপী তাপী মানবের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মালোচনা ও হরিনাম সংকীর্ত্তনে নবদ্বীপ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

১৪০৭ শকে নবদ্বীপধামে জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। ভবিষ্যৎজীবনে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নদীয়া, তথা সারা বাঙ্গলা দেশের আচণ্ডালে হরিনাম ও হরিভক্তিরস বিতরণ করিয়া দেশ ও জাতিকে মরণের মুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন

—একথা বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীবাস আচার্য্য এবং ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণও শ্রীচৈতন্তের এই প্রেমধর্ম্মের পতাকাতলে আসিয়া মিলিত হইয়া ধর্ম্মসাধন-যজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

হরিদাসের জন্মকুল লইয়া নানা মতদ্বৈধ আছে। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন, তিনি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ও তাচ্ছল্যও ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই হরিদাস আজ বৈষ্ণব-জগৎ-পূজ্য মহাপুরুষ। শ্রীচৈতন্যের অমৃত মন্ত্র প্রভাবে যবন হরিদাস আজ 'ঠাকুর হরিদাস' বলিয়া বরণীয় হইয়া আছেন।

শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে, ঠাকুর হরিদাস প্রথমে বেনাপোলের বনমধ্যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় অবস্থান কালে তিনি প্রতিদিন হরিনাম কীর্ত্তনে মত্ত থাকিতেন এবং দিবারাত্রির মধ্যে তিন লক্ষ বার নাম জপ করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। অগাধ ধর্ম্মবিশ্বাস, চিত্তের মহানুভবতা ও চরিত্রের মাধুর্য্য দেখিয়া বেনাপোলবাসী জনগণ তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

একজন সাধারণ তপস্বীর প্রতি গ্রামবাসীর এতাধিক ভক্তি দেখিয়া বেনাপোলের ধর্ম্মদ্বেষী জমীদার রামচন্দ্র খাঁন হরিদাসের ধর্ম্মসাধনা নষ্ট করিবার জন্ত এবং তাঁহাকে লোকচক্ষুর নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্ত এক রূপযৌবনশালিনী বারাঙ্গনাকে নিযুক্ত করেন। তিনি হরিদাসের পরিচয় দিয়া বারাঙ্গনাকে বলেন—

—"এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য ধর্ম্মনাশ ॥"

( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত )

বারাঙ্গনা তিন দিনের মধ্যে হরিদাসের বৈরাগ্য সাধনে বিঘ্ন ঘটাইবে স্থির করিয়া, নানা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একদিন রাত্রে ঠাকুর হরিদাসের

নির্জ্জন আশ্রমে উপস্থিত হইল। তাহার হাবভাব দর্শন করিয়া ঠাকুর সবই বুঝিতে পারিলেন। সহাস্য বদনে তিনি জানাইলেন যে, তিনি এক কোটি নাম জপের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, এই ব্রত সমাপনান্তে তাহার কথা শুনিবেন। পরদিন সন্ধ্যায় নারী আসিলে হরিদাস জানাইলেন, তাঁহার ব্রত এখনও শেষ হয় নাই। তিনি বারাঙ্গনাকে নামজপ শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রভাত হইয়া গেল—জপ আর শেষ হয় না। বারাঙ্গনা চলিয়া গেল। তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যায় নারী পুনরায় আসিয়া তুলসীমঞ্চ ও ঠাকুরকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রমদ্বারে উপবিষ্ট হইল। হরিদাসের নামজপ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। তাঁহার অঙ্গে স্বর্গের জ্যোতিঃ—বদনে যেন মধু ঝরিতেছে। বারাঙ্গনা স্তব্ধভাবে হরিনাম শ্রবণ করিতেছে। একি! নারীর চক্ষে জল কেন? হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে মুগ্ধ হইয়া 'হরি' 'হরি' বলিয়া সে চক্ষু জলে বুক ভাসাইয়া দিল! নামের কি অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি! হরিদাসের সঙ্গপ্রভাব ও নামসংকীর্ত্তনের শক্তিতে বারাঙ্গনার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—তাহার অন্তর ধর্ম্মালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নবালোক প্রাপ্ত হইয়া বারাঙ্গনা আপনার কলুষিত আত্মার অপরাধ স্মরণ করিয়া ঠাকুর হরিদাসের চরণে মুক্তিলাভ আশায় পতিত হইল। হরিদাস কহিলেন—

—"ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লহ তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের দর্শন॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ঠাকুর হরিদাসের মানবহৃদয় অধিকার ও বারাঙ্গনাকে পাপমুক্ত করিবার

অমোঘ শক্তি দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। পাপী তাপী জন তাঁহার পদতলে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল।

"বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে হৈল চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥"

( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত )

সাধু মহাপুরুষগণ কখনই একস্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না ঠাকুর হরিদাস জীবের কল্যাণের জন্যই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—পাপীতাপীর দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করাই তাঁহার অন্যতম সাধনা। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে সপ্তগ্রামের অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলরাম আচার্য্য নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য মহাশয় ঠাকুরের নাম বহুপূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিজ গৃহে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া নিজকে ধন্য মনে করিলেন। দিবারাত্র সাধন ভজন, নাম কীর্ত্তন, ধর্ম্মালোচনা—এই লইয়াই তাঁহারা উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। সপ্তগ্রামে হরিপ্রেমের বন্যা বহিল।

এই সময় একদিন সপ্তগ্রামের অন্তর্গত হরিনদী গ্রামের গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক তার্কিক ব্যক্তি ঠাকুর হরিদাসকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল—

"কোটীজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি না পায়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥"

( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত )

তাহার উত্তরে—

"হরিদাস বলেন—শুনহ মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহার বেদ ভাগবতে কয়॥

পশু, পক্ষী, কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥"

( শ্রীচৈতন্য ভাগবত )

ইহার পর ঠাকুর হরিদাস সুমধুর স্বরে হরিনাম গান করিতে করিতে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। আচার্য্যদেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিলেন,—ইনিই পরম ভক্ত হরিদাস। তথাপি তিনি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন—

—"হরিদাস কহে মুঞি ম্লেচ্ছাধম।
আসিয়াছোঁ তুয়া পদ করিতে দর্শন॥"

( শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ )

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কহিলেন—

"কেবা ছোট কেবা বড় স্থৈর্য্য নাহি জানি।
সাধু আচরণ যাঁর তাঁরে শ্রেষ্ঠ মানি॥"

অতঃপর পরিচয় ও মধুর আলাপ আপ্যায়নে হরিদাসের প্রথম শান্তিপুরে পদার্পণ মধুময় হইয়া উঠিল। আচার্য্যদেব, গঙ্গাতীরে নাম জপ করিবার জন্য হরিদাসকে ফুলিয়ার এক নির্জ্জন স্থানে একটি গোফা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। গোফা—মাটীর একটি গর্ত্ত মাত্র। হরিদাস এই মনোরম স্থানে বসিয়া হরিনামে বিভোর হইলেন।

এই সময় বঙ্গদেশ মুসলমানগণের শাসনাধীনে ছিল এবং শান্তিপুরের বিচার ও শাসনকর্ত্তা ছিলেন গোড়াই কাজী। ঠাকুর হরিদাসের ধর্ম্মসাধনার খ্যাতি শান্তিপুরের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এতটা বাড়াবাড়ি কাজী সাহেবের সহ্য হইল না। মুসলমান হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে দেখিয়া মুসলমানগণ হরিদাসের উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাজী গৌড়াধিপতি হোসেন শাহার নিকট হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলেন। হরিদাসকে বন্দী করিয়া গৌড়ে লইয়া যাইবার আদেশ আসিল। যথাসময়ে হরিদাস গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। বিচারে কঠোর দণ্ড পাইবেন—ইহা জানিয়াও ঠাকুর বলিলেন—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥

( শ্রীচৈতন্য ভাগবত )

বাদশাহের আদেশে তিনি একে একে বাইশটি বাজারে আনীত হন এবং বেত্রদণ্ড ভোগ করেন। কিন্তু প্রেমাবতার হরিদাস ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়েন নাই। সানন্দে হরিনাম গান করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

"বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
মানুষের প্রাণ কি রহয়ে মরণে॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিল যে ইহারে॥
মরেও না আর দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা সবাই ভাবে মনে॥"

হরিদাসের ধর্ম্মতেজ দর্শন করিয়া বাদশা ও কাজী আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন এবং গোফায় বসিয়া যথারীতি নামজপ ও ধর্ম্মসাধন করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

এইবার শ্রীধাম নবদ্বীপ-লীলার কথা। একদিন শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণ সহ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর আছেন, এমন সময় ঠাকুর হরিদাস কৃষ্ণনাম

উচ্চারণ করিতে করিতে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করিলেন। চৈতন্যদেব হরিদাসের পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন—তিনি সহাস্য বদনে হরিদাসকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণ এই সময় নবদ্বীপে ছিলেন, তাঁহারাও হরিদাসকে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। নবদ্বীপে হরিনামের বাণ ডাকিল—সে প্রবল বন্যায় শুধু নবদ্বীপ, শান্তিপুর নহে, সারা নদীয়া ভাসিয়া গেল। জগাই মাধাই উদ্ধার হইল—অসংখ্য পাপীতাপী নরনারী শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শান্তির আলোক প্রাপ্ত হইল।

এই সময় চৈতন্যদেব নীলাচলে গমন করেন। হরিদাস বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া কহিলেন—

"নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন গতি।
নীলাচল যাইতে মোর নাহিক শকতি॥
মুঞি অধম না পাইনু তোমার দরশন।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

চৈতন্যদেব হরিদাসকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—

"তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যথাসময়ে ঠাকুর হরিদাসের নীলাচলে যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। জগন্নাথদেবের মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র ভগবৎপ্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাসকে নিকটে আহ্বান করিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করায়

"হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির ভিতরে যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটামধ্যে স্থান খানিক পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোঙাঙ॥"

( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত )

হরিদাসের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু দুঃখমিশ্রিত আনন্দে হরিদাসকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন এবং কাশীমিশ্রের উদ্যান-বাটিকার এক নিভৃত স্থানে তাঁহার সাধন ভজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

নীলাচলে একদিন রাত্রিতে গোবিন্দ গোস্বামী জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ হইয়া হরিদাসকে দিবার জন্য হৃষ্টচিত্তে হরিদাস সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর অতি ক্ষীণ স্বরে হরিনাম জপ করিতেছেন। গোবিন্দ গোস্বামী মহাপ্রসাদ দিলেন, ঠাকুর হরিদাস অতি কষ্টে তাহা গ্রহণ করিলেন। পরদিন শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাসের এই মুমুর্ষু অবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিতেই, হরিদাস কাতর কণ্ঠে জানাইলেন যে, তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে; ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বাষ্পবিজড়িত স্বরে বলিলেন—

"হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার ও চাঁদবদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তব কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব জীবন॥"

( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত )

হরিদাসের মহাপ্রস্থানের মনোভিলাষ জানিয়া চৈতন্যদেব বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—'ঈশ্বর নাম যদি সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই তোমার আশা সফল হইবে—তুমি অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে '

মহাপ্রস্থানের মহাদিন উপস্থিত। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভু, রামানন্দ প্রভৃতি ঠাকুর হরিদাস সমীপে উপবিষ্ট। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল—সে কীর্ত্তনের রবে সমগ্র নীলাচল কাঁপিয়া উঠিল ভক্তগণের নয়নাশ্রুতে প্রেমের বন্যা বহিল। ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণব-গগনের এক জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র চিরতরে ডুবিয়া গেল—নীলাচলে শোকের নিবিড় অন্ধকার নামিয়া আসিল

ঠাকুর হরিদাসের পবিত্র দেহ শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে সমাহিত করা হইল। শ্রীচৈতন্যদেব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া 'হরিদাস-তিরোধান-মহোৎসব' সম্পন্ন করিলেন—নীলাচলবাসী ভক্ত ও জনগণ মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়া গেল।

ঠাকুর হরিদাস চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালীজাতি ও বাঙ্গলার বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাকে আজিও স্মরণ করিয়া ধন্য হয়। আজিও ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীর পুণ্যতিথিতে বাঙ্গলার বৈষ্ণবগণ হরিদাস-মহোৎসব করিয়া সেই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতির পূজা করিয়া থাকেন। শান্তিপুরের অন্তর্গত পুণ্যসলিলা ভাগীরথী তীরস্থ ফুলিয়া গ্রামে বাঙ্গলার আদিকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভের সন্নিকটে ঠাকুর হরিদাসের সাধনকুপ আজিও বিরাজমান রহিয়া সেই অতীত যুগের ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অধম আমরা, আজ সেই সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ঠাকুর হরিদাসের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া কয়েক ফোঁটা ভক্তিঅশ্রু-অর্ঘ্য তাঁহার শ্রীপদকমলোদ্দেশে অর্পণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র প্রামাণিক।

# মতীর মৃত্যু

হাতের নোয়া সিঁথের সিঁদূর ধুয়ে মুছে
মতী ফিরে এসেছে তার মায়ের কাছে,
মতীর কিন্তু কোন দুঃখ নাই।
মা কাঁদেন—তাঁর ছোট্ট দুধের মেয়েটির
বৈধব্যের ভয়াবহ ভবিষ্যতের কথা ভেবে,
পাড়া প্রতিবেশী সহানুভূতির অশ্রু দিয়ে
শোকের আসরকে রাখে জাগিয়ে,
মতীর কোন দৃকপাত নাই ;
তার নৃত্যচপল মনটিকে ঘিরে
অনাবিল আনন্দ প্রবাহ তেমনিই প্রবাহিত হয়,
সে যেন দোদুল-দোলার দুল্—হাসে গায়—
খেলার ঘর বেঁধে—ঘরকন্নার—গিন্নিপনার খুঁটিনাটিতে ডুবে যায়,
ভুলে যায়—সে একটি নলকপরা কচি মেয়ে।
কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড় বাতাসে
একদিন তার সুখের সংসার মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে
এ ত জানেনা সে ;
অতৃপ্তির মেঘপুঞ্জ হতে
শ্রাবণের বাদল নেমে আসবে তার চোখে
সব ডুবিয়ে দেবে—ভাসিয়ে দেবে
এ চিন্তা তার ধারণার অতীত।

* * * *

প্রতিবেশী নবীনকে সে জ্ঞান হতে জানে,
খেলার সাথী রূপে,
আম চুরির লিচু চুরির গুরুরূপে,
কত নিবিড় পরিচয়—
স্নেহের প্রেমের নিপীড়নে
অচ্ছেদ্য বন্ধনে, গোপনে গোপনে
ভাল লাগার একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে ;
তাকে না দেখলে দেখার স্বার্থকতা থাকে না,
—তার কথা না শুনলে শোনাই হয় না,
প্রাণ-মন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তাকে সে চায় আপনার ক'রে,
নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে- স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে।

নদী,—প্রবাহ ও তটভূমি এই নিয়েই তার সম্পূর্ণতা,
প্রচণ্ড বায়ু-তাড়িত উত্তাল তরঙ্গে
তীরাঞ্চলকে ডুবিয়ে দেওয়া ভাসিয়ে যাওয়া,
তার আনন্দোচ্ছ্বাস নয়,
সে একটা ক্ষণিক উন্মাদ ব্যাকুলতা,
—অনিত্য কালের তাণ্ডব চঞ্চলতা
একটা প্রলাপ।
যৌবনের সোনার কাঠির পরশ এসে লেগেছে
আজ মতীর প্রাণে
যেন দুকূল-প্লাবি' প্লাবনের কলোচ্ছ্বাস,—
ছন্দহীন নৃত্যোৎসব—সঙ্গীতে অসঙ্গতি ;
কিন্তু সে চায় না অমন ভাসিয়ে যাওয়া—
উচ্ছৃঙ্খলতার গুণ কীর্ত্তনে, সে একেবারেই মুগ্ধা নয়,

স্থিতি স্থাপকতার সুপবিত্র বেদীমূলে
তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা,
সে চায় একটা ছন্দবদ্ধ প্রাণবন্ত নাচন,
অথচ রক্তোল্লাসের তাণ্ডবতায় প্রকাশমান নয়,
অথচ অলঙ্কারের বেড়াজালে মোটেই আরষ্ট নয়,
শ্রী ও কল্যাণের মিলন সঙ্গীত
—তায় চাওয়া পাওয়াটিকে ঘিরে
পরিপূর্ণতার পরিসমাপ্তি।
অলক্ষ্যে অদৃষ্ট নিষ্ঠুর পরিহাস করে—সাবধান!

দিন যায় ;—
তার কায়-মন-বাক্যে বসন্তের রঙিন আলোর
ইন্দ্রজাল রচনা হয়ে গেছে,
ফুলের গান,—মৌনতার গাম্ভীর্য্যে তন্ময়।
সন্ধ্যায় প্রদীপখানি জ্বেলে সে প্রণাম করে,—
ওগো অদৃশ্য দেবতা! দয়াল ঠাকুর! যদি ফোটালে
তবে পূজার অর্ঘ্য করে নাও প্রভু!
দিনের কর্ম্ম-কোলাহলে সে থাকে ভুলে,
রাতের নিস্তব্ধতার আস্তরণে নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে সে ভাবে ;-
কত জানা অজানার ঘাত প্রতিঘাতে
বর্ত্তমান এই পরিণতি—
কিন্তু তৃপ্তি কোথা?
ঘুমন্ত রজনীর বুকে সে বিনিদ্র
আর তার সাথী "বৌ কথা কও,"
জ্যোৎস্না-হসিত আকাশপথে সে যায় তাকে ডেকে,
বলে—কথা কও,—বৌ কথা কও!

কোথাকার আনন্দের শিহরণ এসে লাগে
তার মণিকোঠার দুর্জ্জেয় দেবতাটির পায়ে
ক্ষণিকের,
সচল মনকে অচল কারায় বন্ধ করে,
সে চায় স্বাধীনতার সুখৈশ্বর্য্য,
ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ব্যক্তি বিশেষকে জয় কত্তে,
তার অভিগমন ওঠে জেগে,
বন্ধনের আতিশয্যে এগুতে পারেনা একটুও :

নবীনের মহত্ত্ব সে উপলব্ধি করেছে,
তার প্রেম নিবেদনে জেনেছে
সেই ছোট্ট হৃদয়খানিতে তার আসন পাকা হয়ে গেছে।
কিন্তু সাংস্কারিক অন্তরায়—
দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে
তাদের মাঝখানে,
একটা দুর্ভেদ্য বাধা সৃষ্টি করে।
আত্মীয়-অনাত্মীয়ের সন্দেহের ঘৃণ্য দৃষ্টির তীব্র দাহন
তার নিত্য ভোগ্য,
অপরাধের পর্য্যায়ে সে না প'ড়েও
মহা অপরাধিনী,
মা-ও তার মৃত্যুকামনার পক্ষপাতিনী,
এ দুঃখ রাখবার তার স্থান কই !

বেশী দিন নয় ;—
মৃত্যুর আহ্বান এসেছিল তার কাছে
কত যন্ত্রণাই সে পেয়েছে,

রাতের পর রাত, দিনের পর দিন
—সে-ই ত আমাকে তার প্রাণের স্নেহ দিয়ে
হাতের সেবা দিয়ে
হৃদয়ের অমৃত দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে,
তার নিভৃত মনের সবুজ বনে
যে ফুলটি ফুটেছিল সঙ্গোপনে
আমারি পূজায় তাকে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করেছে,
তার চোখের মূক ভাষা কত কথাই না বলেছে
আমার অন্তরের কাণে কাণে,
আজও যে তার প্রতিধ্বনি হচ্ছে দিকে দিকে!

বন্ধনের ছন্দ শৃঙ্খলে জীবন রয়েছে বাঁধা,
উপেক্ষায় অবজ্ঞায় ঠেলে ফেলে, বাঁচতে যে পারিনা এক তিল,
অনুত্তপ্ত মরুদেশ, অ-শীতল তুষারকণা
নীহারিকার ক্ষুদ্রত্ব গুণ-ধর্ম্মের বিরোধী,
মানুষেরও বৈশিষ্ট্য—নিবেদন ও পরিগ্রহণ,
এ দুটোর বিলোপ করা যে সম্ভবই নয়;
না না, আমি তাকে চাই
প্রতিদানে আমাকে বিলিয়ে দেব নিঃশেষ করে।

* * *

শরতের শুভ সূচনা করে শেফালী স্বস্তিক রচনা করেছে
তার পূজার আঙ্গিনায়,
অপরাজিতা লজ্জানত, সসম্ভ্রমে অভিবাদন কচ্ছে
সহকারের আড়ালে আড়ালে,

আনন্দ-শিহরণে বকুল আকুল
লুটিয়ে পড়েছে আপন ভুলে,
হাস্যে মাধুর্য্যে মহিমায় সারা বাঙ্গালা
প্লাবিত হয়েছে কূলে কূলে,
বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে শারদোৎসব,
বালক-বালিকা যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা
আনন্দময়ীর বোধনে উদ্‌বোধিত,
উৎসবানন্দে আত্মহারা,
দুঃখের লেশ মাত্র নাই,
মতী কিন্তু কোন প্রকারে
যোগদান কর্ত্তে পারেনি।
তার জীবনের একটা নূতন অধ্যাযের সূচনা হয়ে গেছে—
শোক কাকে বলে সে জানেনি কোন দিন,
পিতার মৃত্যুর কথা তার মনেই পড়ে না,
একমাত্র মাকে অবলম্বন করেই
সে হেসেখেলে বেড়ে উঠেছিল বল্লরীটির মত,
আজ তার সেই মা-ই চলে গেছেন
তাকে একা ফেলে কোন্ নিরুদ্দেশ লোকে।
আশা-আকাঙ্ক্ষার দাস মানুষ,
কতই না সে ভেবে রেখেছিল
তার জীবন-নাট্যের অভিনয়ের ভূমিকাগুলি,
মনোদ্যানে কত ফুলই না ফুটিয়েছিল
তার চিরারাধ্য দেবতাটির কণ্ঠের ভূষণ হবে বলে ;
মৃগতৃষ্ণিকার মত নিমিষে মিলিয়ে গেছে সব
বেদনার পাষাণ স্তূপ এসে চেপে বসেছে তার বুকে,

একটু সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই ;
এত বড় দুর্ভাগ্য সহ্যের অতীত,
আশ্রয়হীন—বান্ধবহীন—আত্মীয়হীন—
আজ সে পথের কাঙালিনী !

দিনের উদ্‌বোধন,
সোনালী রঙের আলোর প্রথম সঙ্গীতখানি নেমে এসেছে
শ্যামশ্রী গ্রামখানির পরে,
সৌন্দর্য্যের হাস্যধারায় সব প্লবমান,
আনন্দময় কর্ম্মপ্রবাহে দিক দিক মুখরিত ;
মতী তার ভারাক্রান্ত হৃদয়খানি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে,
আজ সে উন্মাদিনী।

ধানে ভরা মাঠগুলিতে সবুজ রঙের মাতামাতি,
নীল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত কেবল অনাহত প্রবাহ,
—স্বপ্নলোকের নৃত্যশালায় অনবদ্য সুরনিক্কণ ;
দোয়েল-ফিঙে পাখনা মেলে তারপরে সাঁতার দেয়,
প্রজাপতিরা সারি বেঁধে তালে বেতালে নেচে যায়,
মেঘগুলো অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে।

এই যে সব আনন্দ-উন্মাদনা—মতীকে স্পর্শ করতে পারেনি একটুও
নবীন এইমাত্র বেরিয়ে পড়েছে তার কাজে,
সম্মুখে মতীকে দেখে হাসির স্বাগত জানালে সে,
কিন্তু তার মুখখানিতে কি যে ব্যাকুলতা ;
চাপা আগুনের একটা অসহ্য উত্তাপ অনুভব কল্লে,
চমকে উঠলো।

কবি গেয়েছেন,—

'বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না'

কিন্তু যাতনার কশাঘাতে তার মুখও ফুটেছে,

প্রথমে মতী তার অভিভাষণে কি বল্লে বোঝা গেল না,

পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্‌লে,— তুমি আশ্রয় দেবে ?

পর-পদলেহী পরান্নভোজী কুকুরের মত নয়—

বাজারের ভাড়াকরা গণিকার মত নয় ;

তোমার অন্তরের অন্তরে যেমনি করে স্থান দিয়েছ

তেমনি করে,

সংসারের রাণী করে,

পত্নীরূপে আশ্রয় চাই ;

আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ নয়,

তোমার ইচ্ছা, তোমার খুসি।

নির্জ্জন পথখানির বুকে যেন মেঘের গর্জ্জন

ছুটোছুটি করে মিলিয়ে গেল,

নবীন নীরব হয়ে চেয়ে রইল তার মুখখানির দিকে,

একটা যুগ বয়ে গেল দুজনের মাঝখান দিয়ে।

নিজেকে সামলে নিয়ে বিনীত ভাবে জানিয়ে দিলে—

সে তাকে তার প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে,

কিন্তু সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনে একেবারেই পরাঙ্মুখ।

মতী কেবল এক কথায় তার জবাব দিয়ে গেল—

ধন্যবাদ !

পরের দিন সবাই শুনলে মতী আর নাই,

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে।

নবীনের অশ্রুঝরার হিসাবনিকাশ যে নেবার সে নিক,
কিন্তু যে সত্যই নবীন, সত্যের নবালোকে যার হৃদয় উদ্ভাসিত
তার বুক ভেসে গেল এই দুঃসংবাদে।

সে বলে—

হে কুসংস্কাররূপী অদৃশ্য দেবতা,
তোমায় বার বার নমস্কার!
সংযত কর তোমার এই নিষ্ঠুর লীলাভিনয়;
আমরা যোদ্ধা, আমরা বীর,
নোয়াব তোমার শির,
রুষিয়া গর্জ্জি উঠিলে বিশ্বে
নয়নে বহাব নীর;
সংহতি-বলে দীপ্ত আমরা
(ওগো) অতীতের অপবাদ,
ফিরে যাও, তুমি ফিরে যাও,
শতেক ধন্যবাদ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

---

# শ্রীশ্রী৺ লোহাজাঙ্গি ঠাকুর ও গঙ্গাপ্রবাহ

শান্তিপুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বানকের ধারে এক বটবৃক্ষতলে একটি প্রাচীন দেবীপীঠ আছে। তাহাকে সকলে লোহাজাঙ্গি ঠাকুর বলেন, অথচ এ পর্য্যন্ত কেহই বলিতে পারেন না যে, লোহাজাঙ্গি কোন্ দেবতা। তবে, সাধারণের বিশ্বাস—উহা দেবীপীঠ। আমাদের

ধর্ম্মগ্রন্থে ঐরূপ নামের কোনও দেবতা বা দেবীর নাম পাওয়া যায় না। এই কারণে অনেকে মনে করেন, উহা কোনও বৌদ্ধযুগের দেবতা বা দেবীমূর্ত্তি,—পরবর্ত্তী কালে হিন্দুদেবতা রূপে পূজাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। কথাটি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। শুনিতে পাই, লৌহজঙ্গ শব্দের অপভ্রংশে লোহাজাঙ্গি শব্দ। ঢাকা জেলায় লৌহজঙ্গ নামে একটি গ্রাম আছে, কিন্তু তথায় ঐরূপ কোন দেব বা দেবী আছেন কিনা, জানা যায় না। আমাদের এখানে কিন্তু ঐ নামে গ্রাম নাই, অথচ দেবতার পীঠ রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, লৌহজঙ্গ শব্দ বাঙ্গালা ভাষার শব্দ নহে, উহা প্রাকৃত ভাষার কথা। হয়ত পুরাকালে কোনও বৌদ্ধবিহার এইস্থানে ছিল, অথবা কোন তান্ত্রিক বৌদ্ধ কর্ত্তৃক এই দেবীপীঠ এখানে প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে এইরূপ অনেক দেবদেবীর নাম পাওয়া যায়, যাঁহারা পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুধর্ম্মের দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন. যেমন ধর্ম্মপূজা, ধর্ম্মরাজ, বুড়রাজ প্রভৃতির পূজা, উলাইচণ্ডী বা উলুইচণ্ডী মাতার পূজা প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত, বৃক্ষতলে একখণ্ড শিলা রাখিয়া দেবতা জ্ঞানে পূজা—ইহাও বৌদ্ধদেবতার নিদর্শন। এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকায় "হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রাস করিল কিরূপে?" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম তাহারই আলোচনা করা যাউক। একবার আমি জনৈক বন্ধুসহ চৈত্রমাসের শেষভাগে ৺ বাসন্তী পূজার সময় লোহাজাঙ্গি দর্শনে গমন করি। তথায় দেখিলাম একটি বৃহৎ বটবৃক্ষতলে হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি একাসনে উপবিষ্ট। জনৈক পুরোহিত পূজা করিতেছেন। শুনিলাম, ৺বাসন্তী পূজার সময় দিবসত্রয় মাতার পূজা কয়েক বৎসর হইতে হইতেছে। চতুর্থ দিবসে বিজয়া-দশমীর দিন দেবীর নিরঞ্জন হয়। দুই একবার ঐস্থানে সমারোহ

সহকারে 'অষ্টম প্রহর' ও মহোৎসব হইয়াছিল। আমরা দুইজনে দেবী-দর্শনান্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অদূরে এক বৃক্ষতলে কয়েক খণ্ড গোলাকার প্রস্তরের চাকি দেখিতে পাইলাম। ঐ চাকি গুলির মধ্যভাগে একটি করিয়া বড় ছিদ্র রহিয়াছে। সেগুলি উপর্য্যুপরি সাজাইলে একটি ছোট মন্দিরের মত বা এক ঝাল বাটখারার মত দেখায়। ইহা দৃষ্টে আমাদের মনে দুইটি প্রশ্ন জাগিল,—হয় ইহা কোন শিবলিঙ্গের ভগ্ন অর্দ্ধাংশ, অথবা ইহা বৌদ্ধযুগের কোন দেবমূর্ত্তি, অর্থাৎ—শূন্যবাদের নিদর্শনসূচক।

লোকপরম্পরায় শুনিতে পাই, এইস্থানে দেবীর মাহাত্ম্য বিশেষ প্রকট। কেহ একাকী রাত্রিকালে এই স্থানে থাকিতে পারে না, নানা প্রকারের বিভীষিকা দর্শন করে। ইহার নিকটবর্ত্তী কোন জমিতে কেহ চাষ করিতে সাহসী হয় না। সাধারণের ধারণা, এই স্থানে আবাদ করিলে অনিষ্ট ঘটিবে। একবার জনৈক কৃষক কাহারও নিষেধ না শুনিয়া এই দেবীপীঠের নিকটবর্ত্তী ভূমিতে লাঙ্গল দেয়। সে একদিন স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পায়,—"ঐস্থানে আবাদ করিস্ না কৃষক।" ঐ কথা গ্রাহ্য না করিয়া সে ঐ ভূমিতে আবাদ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তদবধি কেহ আর ঐ স্থান সংলগ্ন ভূমিতে আবাদ করিতে সাহসী হয় না।

অতি প্রাচীন কালে ঐ স্থান দিয়া গঙ্গার প্রবল প্রবাহ বিদ্যমান ছিল। সে সময়ে বড় বড় সওদাগরী নৌকা ঐ স্থান দিয়া নানা দেশে গমনাগমন করিত। তৎকালে শান্তিপুর বাঙ্গালাদেশের মধ্যে একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত ছিল। হরিনদী সে সময়ে শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল। সপ্তগ্রাম হইতে যে সকল বাণিজ্য-পোত গৌড় পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত, তাহারা হরিনদী বন্দরে জাহাজ ভিড়াইয়া শান্তিপুরে নানাবিধ দ্রব্য আমদানী রপ্তানী করিত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উঠিতে পারে যে, তৎকালে বানকের মধ্য দিয়া গঙ্গার প্রবল প্রবাহ বিদ্যমান ছিল, আবার হরিনদী শান্তিপুরের বন্দর ছিল,—ইহা যেন পরস্পর বিরোধী কথা। সেই কারণে আমি মনে করি, তৎকালে গঙ্গার গতি কি ভাবে কোথা দিয়া প্রবাহিত ছিল, তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

এক সময়ে শান্তিপুরের তিন দিকে গঙ্গা ছিল, তাহা অনেকেই শুনিয়াছেন। অদ্বৈতমঙ্গল গ্রন্থে আমরা পাই—

"শান্তিপুরে সুরধুনী বহে তিন ভাগে।"

এই তিন দিক—উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম। গঙ্গার একটী শাখা বাবলার দক্ষিণ ভাগ দিয়া কিয়দ্দূর গিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া বানক ও নির্ঝরের মধ্য দিয়া সারাগড় হইয়া বক্তারের ঘাটে মূল গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। মূল গঙ্গা, অর্থাৎ গঙ্গার যে প্রধান শাখা নবদ্বীপ হইতে বরাবর কালনা ও গুপ্তিপাড়ার পার্শ্ব দিয়া, শান্তিপুরের দক্ষিণভাগে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বয়রা পর্য্যন্ত গিয়া বক্রাকারে কুলিয়ার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল।

এক্ষণে একটা কথা উঠিতে পারে যে, বাবলা ও নির্ঝরের মধ্য দিয়া গঙ্গার যে শাখা বহতা ছিল, তাহার মূল কোথায়? এক সময়ে নবদ্বীপ হইতে যে মূল বা প্রাচীন গঙ্গা শান্তিপুর দিয়া প্রবাহিত ছিল, তাহা হইতে একটী শাখা স্বরূপগঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত নদীয়ার মহারাজের বাগানবাড়ী বা গঙ্গাবাসের জন্য নির্ম্মিত 'গঙ্গাবাস' ও 'আনন্দবাস' নামক গ্রামের দক্ষিণ-ভাগ দিয়া, এবং বাগাচাঁড়ার নিকটবর্ত্তী সগুণা ও ভালুকা গ্রামের উত্তর ভাগ দিয়া বহির্গত হইয়া বক্রগতিতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়; তাহার একটী শাখা পশ্চিমে বাগাচঁড়ায় বাগ্‌দেবী-তলা দিয়া সাবেক গঙ্গায় মিলিত হয়। ইহাকে লোকে "বাগ্‌দেবী-নদী" বলিত। গোবিন্দদাসের করচায় গোবিন্দদাস গঙ্গার ওপার হইতে নবদ্বীপ আসিবার কালে বলিয়াছিলেন,—"ডাহিনে বাগ্‌দেবী নদী—"।

এই শাখার উভয় পার্শ্বে টেংরা, আমঘাটা, গঙ্গাবাস, উশিদপুর, ভালুকা, শিঙেডাঙ্গা, গোয়ালপাড়া, কুলে, করমচাপুর প্রভৃতি গ্রাম পড়ে।

অপর শাখাটী বক্রগতিতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া দিগ্‌নগরের পশ্চিম-পার্শ্ব দিয়া গোবিন্দপুর ও ডিঙ্গিপোতা গ্রামের পার্শ্ব দিয়া আসিয়া দুইটী শাখা হইয়া পড়ে। ইহার একটী শাখা পশ্চিমাভিমুখে রঘুনাথপুরের সন্নিকটস্থ রঘুমণ্ডলের দীঘি নামক বৃহৎ পুষ্করিণী যেস্থানে আছে, ঐ স্থান পর্য্যন্ত গমন করে। অপর শাখাটী ডিঙ্গিপোঁতা ও কুতুবপুরের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর আসিয়া শান্তিপুর ষ্টেশনের উত্তরে যে পোল আছে, তাহার মধ্য দিয়া বাবলার দক্ষিণভাগ এবং বানক ও নির্ঝরের মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বক্তারের ঘাটে সাড়াগড়ের নিকটে সাবেক গঙ্গার সহিত মিলিত হয়।

আবার কোনও এক সময়ে বাবলা হইতে ঐ শাখাটী পূর্ব্বাভিমুখে উলা পর্য্যন্ত গিয়া খিসমা হইয়া বৈঁচি গ্রামের নিকট দিয়া বা বৈঁচি ষ্টেশনের পার্শ্ব দিয়া বক্রভাবে ফুলিয়ায় আসিয়া কিঞ্চিৎ ঘুরিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হয়।

বাবলা হইতে উলা হইয়া গঙ্গার এই শাখাটী বিভিন্ন সময়ে আরও দুইটী স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল, তাহা পুরাতন খাত দৃষ্টে ও লোকমুখে জানিতে পারা যায়। ঐ শাখাটী উলা হইতে খিসমা দিয়া এক সময়ে চূর্ণি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল।

আবার এক সময়ে ঐ শাখাটী উলা হইতে তির্য্যক গতিতে বৈঁচি ও মাধবপুর বা হবিবপুর ষ্টেশনের মধ্য দিয়া হবিবপুরের পার্শ্ব দিয়া বরাবর তারাপুরের সন্নিকটে আসিয়া সাবেক গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। হবিবপুর হইতে তারাপুর পর্য্যন্ত যে প্রকাণ্ড বিল "আম্‌দা বিল" নামে খ্যাত, তাহা গঙ্গার ঐ শাখা মজিয়া গিয়া বিলে পরিণত হইয়াছে, বেশ বুঝিতে পারা যায়।

আবার অন্য কোনও সময়ে উলা হইতে ফুলিয়ার পার্শ্ব দিয়া যে শাখাটী প্রবাহিত ছিল, তাহা বৈঁচি হইয়া নবলা গ্রামের পার্শ্ব দিয়া আসিয়া সাবেক গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। নবলার নিকট সে সময়ে "ত্রেমোহানী" ছিল, প্রাচীনগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে শাখাটী রঘুমণ্ডলের দীঘির নিকট গিয়াছিল, তাহা কোথায় গিয়া মিলিত হইল? তাহার উত্তর এই যে, সেই শাখাটী রঘুমণ্ডলের দীঘি হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে মেলের মাঠের মধ্য দিয়া আসিয়াই নূতনহাটের পশ্চিমে যে স্থানে বর্ত্তমানে 'পালের দীঘি' আছে, ঐ স্থান দিয়া ফাঁড়ির গর্ত্ত, সরিবৎ উল্লার পুকুর বা সরের-পুকুর, লঙ্কাপুকুর, রায়পুকুর, সাহাদের পুকুর প্রভৃতি স্থান দিয়া খালের মধ্য (অবশ্য খাল তখন ছিল না) দিয়া সাবেক গঙ্গায় আসিয়া মিলিত হইয়াছিল।

গঙ্গার এই প্রাচীন শাখাগুলির খাতের চিহ্ন অদ্যাপিও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে, একটু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিলেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাবলার নিকট গঙ্গপ্রবাহ বিদ্যমান ছিল এবং হরিনদী শান্তিপুরের বন্দর ছিল।

তৎকালে শান্তিপুরের চতুর্দ্দিকে এইভাবে গঙ্গা-প্রবাহ বিদ্যমান থাকায় জলপথে বৃহৎ বৃহৎ পণ্যবাহী অর্ণবপোত সমূহ যাতায়াত করিত। তাহাতে শান্তিপুরের সহিত বহু স্থানের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় শান্তিপুর এবং ঐ সমস্ত জনপদ বাণিজ্যসম্পদে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এইবার পূর্ব্ব-বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রবাদ এইরূপ যে, কোনও এক সময়ে জনৈক সওদাগর সাতখানি ডিঙ্গা পণ্য পূর্ণ করিয়া বাণিজ্য-ব্যপ-দেশে বাবলার দক্ষিণের গঙ্গা দিয়া ডিঙ্গিপোঁতা ও কুতুবপুরের নিকট দিয়া যাইবার কালে কুতুবপুরের জয়চণ্ডীদেবীর উদ্দেশে মানত করেন

—"যদি এইবার বাণিজ্যে লাভবান হই, তবে ফিরিয়া আসিয়া মা, তোমাকে সাধ্যমত পূজা দিব।" কিছুকাল পরে উক্ত সওদাগর প্রত্যা-বর্ত্তন-কালে স্বীয় প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হন। হঠাৎ একদিন ঝড়জলে তাঁহার কয়েকখানি ডিঙ্গা গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয়।

সওদাগর এই আকস্মিক বিপদে ম্রিয়মাণ হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন, পরে চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় মানসিক পূজার কথা মনে পড়িয়া যায়; তখন দেবীর ক্রোধবশতঃ এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে মনে করিয়া করযোড়ে দেবীর উদ্দেশে ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ইত্যবসরে তাঁহার তরী স্রোতমুখে অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, নিকটেই লোহাজাঙ্গি দেবীর পীঠস্থান দৃষ্টে তথায় অবতরণপূর্ব্বক দেবীর নিকটে ক্রটী স্বীকার করিয়া স্বীয় মানসিক পূজা অর্পণ করেন। তদবধি কুতুব-পুরের জয়চণ্ডী ও শান্তিপুরের লোহাজাঙ্গি দেবী বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া বিখ্যাত হন। যে স্থানে সওদাগরের ডিঙ্গা জলমগ্ন হয়, সেই স্থান তখন হইতে 'ডিঙ্গিপোঁতা' নামে অভিহিত হয়।

ঐ সওদাগর যে কে, তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন, তিনি 'ধনপতি সদাগর', কেহ কেহ বলেন 'শ্রীমন্ত সদাগর'। কিন্তু এ কথা প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে দেখা যায়, তাঁহারা শান্তিপুরের দক্ষিণে মল গঙ্গা দিয়া সিংহল দেশে গমন করিয়া-ছিলেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"নায়্যায় পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল পুরী অম্বিকা মুলুক॥
বাহ বাহ বল্যা ঘন পড়ে গেল সাড়া।
বামভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া॥

উলা বাহিয়া যায় খিস্‌মার আশে পাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে॥
মহেশপুর সদাগর বাহিল তখন।
ফুলিয়ার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন॥"

এই বর্ণনা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ধনপতি সদাগর ডিঙ্গিপোঁতো ও কুতুবপুরের পথে গমন করেন নাই। আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে,—তখনকার গঙ্গার গতি। শান্তিপুরের পূর্ব্ব দিকে অদূরে ফুলিয়া, কিন্তু জলপথে উলা, খিস্‌মা হইয়া মহেশপুর দিয়া সাধুর ডিঙ্গা ফুলিয়ার ঘাটে দর্শন দিল। গঙ্গার গতি তখন এতই বক্র ছিল।

দ্বিতীয় কথা, ধনপতি সদাগরের নৌকা এখানে জলমগ্ন হয় নাই। কমলেকামিনী দর্শন করাইতে না পারায় সিংহল-রাজ কর্ত্তৃক সমস্ত দ্রব্য রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হয়। ধনপতি সদাগর বন্দী হন; আর শ্রীমন্ত সদাগর ঝড়-তুফানে পতিত হইয়া দেবীর আরাধনা করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, উলায় উলুইচণ্ডীদেবীর পূজা করিয়া তবে তিনি সিংহলে যাত্রা করেন।

কোন্ সময়ে যে এইরূপ গঙ্গার গতি ছিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। তবে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রায় সার্দ্ধ তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে গঙ্গার গতি ঐরূপভাবে প্রবাহিত ছিল: কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী রচনা কাল প্রায় সাড়ে তিন শত পূর্ব্বে। কবি স্বীয় গৃহে চণ্ডী রচনা কাল নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ;—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
সেই কালে দিলা গীত হরের বণিতা॥"

'শাকে রস, রস, বেদ, শশাঙ্ক গণিতা' এই শ্লোকে আমরা পাই, ৯৯৪১—১৪৯৯ শক। বর্ত্তমানে ১৮৫৭ শকাব্দ, সুতরাং দেখা যায় ৩৫৮ বর্ষ পূর্ব্বে চণ্ডীকাব্য রচনার কাল।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সমসাময়িক কালে, প্রায় পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বেও বাবলার দক্ষিণ ভাগ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন তাহা অনেকেই শুনিয়াছেন। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে দেখিতে পাই, এক সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-আশ্রমে আসিবার কালে, নবদ্বীপের সন্নিকটে ললিতপুর গ্রামে জনৈক বামাচারী সন্ন্যাসীকে কৃপা করিয়া তাঁহার আশ্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী শেষে "আনন্দ" দিব কিনা জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্য প্রভু বিস্ময়ে নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন "আনন্দ কি ?" তিনি তদুত্তরে বলেন "মদ্য।" মদ্যের নাম শুনিয়া তিনি লম্ফ দিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়েন এবং গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করেন। উভয়ে গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ করিতে করিতে শান্তিপুরে অদ্বৈত-আশ্রমে আসিয়া উপনীত হন। এই বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ললিতপুর গ্রাম সম্ভবতঃ স্বরূপগঞ্জের নিকটে ছিল, এবং তাহার দক্ষিণ ভাগ দিয়া যে শাখা ডিঙ্গিপোঁতা কুতুবপুর হইয়া বাবলার দক্ষিণ ভাগ দিয়া বহতা ছিল, সেই শাখা দিয়া তাঁহারা দুইজনে শান্তিপুর আসিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সার্দ্ধ চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহারা এইভাবে সন্তরণে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন।

আর এক কথা, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পিতৃদেব কুবের আচার্য্য যখন শান্তিপুরে আসেন, তখন তিনিও গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ নৃসিংহ নাড়িয়াল যে সময় শান্তিপুরে বাস করিয়াছিলেন, সে সময়েও তিনি গঙ্গাতীরে বাস করেন। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, পাঁচ শত হইতে সাত শত বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গঙ্গার ঐ শাখা বাবলার দক্ষিণ ভাগ দিয়া প্রবাহিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

কথাটা আর এক দিক দিয়া আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে ফুলিয়ার নিকট দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আত্মজীবনীতে আমরা পাই, তিনি লিখিয়াছেন

—"দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিনী।" কবি কৃত্তিবাস কোন্ সময়ের লোক? যদিচ তাঁহার জন্মসময় এখনও পর্য্যন্ত সুমীমাংসিত হয় নাই, তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁহার সময় পাঁচ শত বর্ষের অধিক কাল।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নৃসিংহ ওঝা যে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়া ফুলিয়ায় বাস করেন, সে সময়েও ফুলিয়ার নিকট দিয়া গঙ্গা-প্রবাহ বিদ্যমান ছিল। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, আন্দাজ ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বেও ফুলিয়ার নিকট গঙ্গার একটী শাখা প্রবাহিত ছিল।

উপরোক্ত বিবরণ সমূহ হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সার্দ্ধ তিন শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে প্রায় সাত শত বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গঙ্গার এই সমুদয় শাখা উপরোক্ত নানা স্থান দিয়া নানাভাবে প্রবাহিত ছিল; তাহার প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল।

---

# এর চেয়ে বেশী কিছু নয়

এর চেয়ে বেশী কিছু নয়—
নিরালা গ্রামের কোণে শান্ত সৌম্য বনচ্ছায়াতলে
শুধু চাই একটু আশ্রয়।
কোনরূপে মোর এই জীবনখানিরে
পল্লীমা'র বক্ষঃ-স্নেহচ্ছায়ে যদি পারি বহিবারে,
শুধু তুমি রবে সেথা আর আমি রবো—

সভ্যতার কোন গ্লানি—জীবনের ব্যস্ত কলরব
পশিবে না সেথা কভু। শুধু তুমি আমি
দুঁহু দোঁহা মুখোমুখি—দিবা আর যামী
শান্তিসুখে নিরজনে কাটাইয়া দিব ওগো
মোদের এ জীবনের বাকী ক'টি দিন
অতৃপ্তি বিহীন।
তুমি মোর সাথে প্রিয়া! বিজন কুটীরে
সুনির্জ্জনে ধীরে
জীবনের মধুভরা পাত্রখানি উজাড় করিয়া
পরাণ ভরিয়া
পান করি লবে।

কোন ঘোর গভীর নিশীথে
আচম্বিতে
জাগি' উঠি চুমা দিয়ে মোর মুখে চোখে
গোপন পুলকে
গান গাবে, কণ্ঠে ল'য়ে অলকার গোপন সুষমা
হে নিরুপমা!—
আমি ধীরে জেগে উঠে র'ব শুধু তব ঐ মুখপানে চেয়ে
পুলক বিস্ময়ে।
সুচঞ্চলা নিষ্ঠুরা সে কালবৈশাখীতে
তোমার বীণাতে
কভু বা বাজাবে তুমি মরণের জয়যাত্রাগান
—উদাত্ত অম্লান।

চ্যুত মুকুলের বাসে বিহ্বল পরাণে
অতি সযতনে
মোর কণ্ঠে বাহু দিয়া পড়িবে হেলিয়া
হে আমার প্রিয়া !
সোহাগের ভরে।

কভু বরষার বারিধারা সাথে
গোপন ব্যথাতে
আমারি অন্তর যবে উঠিবে কাঁপিয়া
থাকিয়া থাকিয়া—
তুমি মোর মুখে চাহি ব্যথা পাবে
তব নম্র বুকে।
কভু বা কৌতুকে
মোর সনে ক্রীড়া করি কলহের ভরে
রহস্যের ঘোরে
আমারে বাঁধিবে তুমি প্রণয়ের লীলার বাঁধনে—
যবে স্নিগ্ধ শরতের সুনীল গগনে
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় শুভ্রকান্তি বলাকার দল—
যৌবন-উচ্ছল

বসন্তের বনে বনে
কোন শুভক্ষণে
আগুন লাগিবে যবে—দখিনা সমীরে
ধীরে ধীরে

কম্পন জাগায়ে দেবে তরুশাখে কুঞ্জবীথিকায়—
সেই স্নিগ্ধ কুটীর-ছায়ায়
দোঁহে দোঁহা বসিব গো—মুখোমুখী। কথা হবে হারা—
দিশে হারা
দুটী প্রাণ মিশি যাবে একটী পরাণে—
জীবনের সব বিফলতা
রাঙা হ'য়ে উঠিবে গো
একটী চুম্বনে—
নম্র তব বক্ষে মোর বক্ষখানি দিয়া
হে আমার প্রিয়া!
জগত ভুলিব মোরা—ওষ্ঠ শুধু অধরে চিনিবে—
জীবনের সব মধু সব গন্ধ
জিনিয়া লইবে,—
এর চেয়ে বেশী কিছু নয়—
মোরা চাই একটু আশ্রয়।

শ্রীনীরদকুমার লাহিড়ী, এম-এ

---

# ছবির দেশ সিমলা

হাওড়া হইতে আমরা তিন জনে বরাবর বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেশ—বহু ছোটবড় নদী এবং শেষে "যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনে" পশ্চাতে রাখিয়া ১১০৫ মাইল দূরে কাল্‌কা ষ্টেসনে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। দুই দিন পরে মাটিতে পা দিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। রাত্রিটা

'ওয়েটিং-রুমে' কাটাইবার জন্য সঙ্গের জিনিসপত্র সেখানে লইয়া যাইলাম। পরদিন প্রভাতে, বহুকাল-বাঞ্ছিত ছবির দেশে যাত্রা করিব,—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। মাননীয় বৃদ্ধ-দাদা আমাদের খুব ভোরে ডাকিয়া দিলেন; তখনও চারিদিকে বেশ অন্ধকার, পাহাড়গুলি নীরব নীলাকাশ-তলে তখনও ঘুমাইয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে মোট-ঘাট ঠিক করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। নানা দেশ-বিদেশের নানা রকম যাত্রী, গাড়ীতে বেশ গুলজার করিয়া বসিয়া আছে। কলিকাতার ট্রেণে মাথা-খোলা বাঙ্গালীর দল ছাড়া যেমন অন্য প্রদেশের লোক কম, পাঞ্জাব প্রদেশে সিমলার গাড়ীতে পাঞ্জাবী ভিন্ন অন্য লোকও খুব বেশী। কত রকমের স্ত্রী-পুরুষ, কত রকমের পাগ্ড়ী, কত রকমের বিচিত্র পোষাক এবং কত রকমের ভাষা! তবে তাহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দি ভাষা বোঝে। ভারতের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি ভ্রমণ করিতে হইলে হিন্দি ভাষা জানা প্রয়োজন।

সকাল সাতটার সময় আমাদের গাড়ী সিমলা-শৈলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। একটু যাইয়াই ইঞ্জিন বিকট শব্দ করিতে করিতে পাহাড়ের গায়ে বাঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। কাল্কা-সিমলা-রেলপথ ২ ফিট ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং প্রায় ৬০ মাইল লম্বা। ইহা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর প্রথম খোলা হয়। এই রেলপথ ১০২টী সুড়ঙ্গের (Tunnel) মধ্য দিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী হইতে কসৌলী পাহাড়ের পেস্টুর হাঁসপাতালের (Pasteur Institute—পাগলা কুকুরে কামড়ান রোগীর চিকিৎসালয়) চূড়াগুলি দেখা যাইতে লাগিল। এই হাঁসপাতাল দেখিয়া মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। এখানে এক সময় আমার এক আত্মীয় ডাক্তার ছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের চারি দিক হইতে আগত বাঙ্গালী রোগীদের নানা প্রকারে সাহায্য করিতে তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন হায়! সেই উদারপ্রাণ মানুষটি আজ

এই ধরাধাম ছাড়িয়া কোন্ সুদূর দেশে চলিয়া গিয়াছেন। রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার মধুর স্মৃতি! দেখিতে দেখিতে আমরা ধরমপুরে আসিয়া পড়িলাম। ষ্টেশন হইতেই ক্ষয়কাশ রোগের হাঁসপাতাল চোখে পড়িল। এই হাঁসপাতালটি দেখিতে বেশ সুন্দর। ইহা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় করদরাজন্যবৃন্দের সাহায্যে নির্ম্মিত হয়। যে সকল মহাত্মা এই মহৎ কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে আমরা সত্যই কৃতজ্ঞ।

আমার পাহাড়ে রেল চড়া এই প্রথম। সেই জন্য এখানকার দৃশ্য আমার বেশ নূতন বলিয়া বোধ হইতেছিল। পাহাড়ের উপর পাহাড়ীরা স্ত্রীপুরুষে ছোট ছোট ক্ষেত করিয়াছে, আর তাহাতে তাহারা খুব আগ্রহ সহকারে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া কাজ করিতেছে। তাহাদের দেহ খুবই দৃঢ় ভাবে গঠিত। পরমেশ্বর যেন এই দুর্ভেদ্য পাহাড় ভাঙ্গিয়া চাষ করার উপযুক্ত করিয়াই তাহাদের গড়িয়াছেন। চেহারার মধ্যে এমন একটা মাধুর্য্য, এমন একটা লালিত্য আছে যে, তাহাদের দেখিলেই মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। তাহাদের মধুর হাসি বড়ই মিষ্ট—বড়ই সরল।

ছাব্বিশ মাইল যাইয়া বোরোগ্ সুড়ঙ্গের ( Borough Tunnel ) মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। গার্ড-সাহেব অমনি বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়া 'ঘন তমসাবৃত' গাড়ীখানি একেবারে আলোকময় করিয়া দিলেন। এই টনেল ৩,৭৫২ ফিট্ লম্বা। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় টনেল্। গাড়ী বোরোগ্ ষ্টেশনে আসিল। এই স্থানটি স্বর্গের মত সুন্দর। চারিধারে পাহাড়গুলি থরে থরে সাজান রহিয়াছে। নূতন রকমের অনেক গাছ পাহাড়ের উপরে ও নীচে সারি সারি কে যেন নিপুণ হস্তে সাজাইয়া রাখিয়াছে। কোথাও বা বৃক্ষাবলী গাঢ় ভাবে গভীর খাদের ভিতর দিয়া মাথা উঁচু করিয়া বাহির হইয়াছে, কোথাও বা চিরপ্রফুল্ল

প্রস্রবণ ঝর ঝর ঝঙ্কার ঝরিয়া স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিতেছে। এই বোরোগ্ ষ্টেশনটির চারিদিকে নানা প্রকার ফুলের গাছ অতি সুন্দররূপে সাজান। অধিকাংশ গাছেই ফুল ফুটিয়া সেই মনোরম স্থানটির শোভা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। বৎসরের সকল সময়েই এই সব স্থানে সুন্দর সুন্দর ফুল দেখা যায়। বোরোগে হিন্দু এবং সাহেবদিগের জন্য দুইটি বেশ পরিষ্কার হোটেল আছে, সেখানে সকল রকম খাবার, এমন কি ডাল-ভাত পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এখানে হোটেল ভিন্ন অন্যান্য খাবার এবং ফলেরও দোকান আছে। সাহেবরা সব খাইতে নামিলেন। আমরাও পাহাড়ীদের দোকান হইতে আলু-দহির বড়া, দহি এবং নূতন রকমের কিছু খাবার ও ফল কিনিয়া বেশ আরামে ভোজন করিয়া ঝরণার শীতল জল পানে দেহ শীতল করিলাম।

দ্বিগুণ উৎসাহে গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। গাড়ী একবার খুব উঁচুতে উঠিতেছে—আবার অল্পক্ষণ পরেই দেখি খুব নীচে নামিয়া গিয়াছে। কখনও মনে হইতেছে গাড়ী একই স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। কোথাও বা উপর-নীচে পাশাপাশি ৪।৫টি লাইন দেখা যাইতেছে। কখনও ভয় হইতেছে, যেন এখানে গভীর খাদের মধ্যে গাড়ী পড়িয়া যাইবে এবং এই খানেই আমাদের ভব-লীলা শেষ হইবে! মাঝে মাঝে অন্ধকার টনেলের মধ্য দিয়া গাড়ী ভীষণ শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইতেছে। সিমলার রেলপথ স্থপতিবিদ্যার নিপুণতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ। এইরূপ গাড়ীর গতি, চারিদিকের অপার্থিব মনোরম সৌন্দর্য্য, মাঝে মাঝে ষ্টেশন সমূহের নিকটস্থিত নয়নাভিরাম বাঙ্গলো ও ফলফুলের সাজান' বাগানগুলি দেখিতে দেখিতে আমরা তারাদেবী ষ্টেশনে আসিলাম। এখান হইতে সিমলা-শৈলের বাড়ীগুলি যেন এক-একখানি পটে আঁকা ছবির মত বোধ হইতেছিল।

এখানে বেশ শীত বোধ হওয়াতে আমরা গরম কাপড় বাহির

করিয়া লইলাম। গাড়ী আমাদের লইয়া গজেন্দ্র-গমনে শীঘ্রই সিমলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখ বাড়াইয়া প্লাটফরমের দিকে চাহিয়া দেখি যে, ছোট্ট রঘুবাবুটি পা পর্য্যন্ত গরম জামা পরিয়া বড়লাট সাহেবের দপ্তরের ঘোর লালরঙের চাপকান-পরা চাপরাসি সঙ্গে করিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

আমাদের জিনিসপত্র একটা পাহাড়ী মুটের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া কালীবাড়ীর উঁচু পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। মুটে আমাদের নানান্ জিনিষ দেখাইতে দেখাইতে কখনও বা আগে কখনও বা পরে চলিতে লাগিল। আমাদের দেশের মত তাহারা মাথায় মোট লয় না। যত ভারি বোঝা হউক না কেন, তাহারা পিঠে বাঁধিয়া লইয়া যায়। উঁচু-নীচু, আঁকা-বাঁকা রাস্তার উপর দিয়া বড় রাস্তায় আসিলাম। সম্মুখেই রেলওয়ে-বোর্ডের প্রকাণ্ড আফিস বাড়ী। কোট-পেণ্টালুন-পরা অনেক বাঙ্গালী বাবু ঐ আফিসের উপরে এবং নীচের রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন আমাদের দেখিয়া, আমরা কোথা হইতে আসিতেছি, কাহার বাড়ী যাইব, কলিকাতার খবর কি প্রভৃতি অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। দূরদেশে বাঙ্গালী দেখিলে বাস্তবিকই মনে বেশ একটু আনন্দ হয়। রাস্তার দুই ধারের ছোট বড় সুন্দর সুন্দর বাগানের মধ্যে ছবির মত বাড়ীগুলি দেখিতে দেখিতে আমরা কালীবাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইলাম।

এই কালীবাড়ীটি সহরের খুব উঁচু জায়গায় প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা সিমলার কর্ম্মক্লান্ত বাঙ্গালীর বিশ্রাম-স্থান, ধর্ম্মক্ষেত্র, মিলন-মন্দির এবং বিদেশ হইতে আগত অতিথি বাঙ্গালীর স্বর্গ। পাঞ্জাবের এবং যুক্তপ্রদেশের অনেক বিখ্যাত সহরে বাঙ্গালীর এইরূপ "কালীবাড়ী" আছে। আমরা দোতলার ঘরে শয্যা রচনা করিয়া খানিকটা বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিয়া লইলাম। একটু পরেই

মন্দির হইতে প্রচুর প্রসাদী ফলমূল, সন্দেশ, মিঠাই প্রভৃতি আসিল। তাহাতেই আমাদের পেট ভরিয়া গেল। বৈকালের দিকে টিপি টিপি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মেঘ-বৃষ্টি-বাতাসে আকাশ পাহাড় এক হইয়া চারিদিক যেন ধুমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রকৃতির এই নূতন রূপ দেখিতে লাগিলাম ওদিকে মন্দিরের মধ্যে ওস্তাদ্‌জী সেতার বাজাইয়া গান ধরিয়া দিয়াছেন। গীত গাহিয়া ভজন সাধনের উপযুক্ত সময়ই বটে। মন্দিরের মধ্যে নানাপ্রকার ছবি, বহু মহাজন-বাক্য এবং বৈদ্যুতিক আলোর ঝাড় সুন্দর ভাবে সাজানো। দুর্গাপূজার সময় এখানে কয়েক দিন খুব ঘটা হয়। সিমলার বাঙ্গালী ও অন্যান্য প্রদেশের বহু স্ত্রীপুরুষ এই উৎসবে যোগদান করেন।

সেদিন বিজয়া দশমী। সন্ধ্যার পর অনেকে এখানে আসিলেন। বড় আনন্দের দিন—মহা মিলনের দিন, আজ পুরাণ দিনের যত কিছু বেদনা সব ভুলিয়া প্রেমালিঙ্গনের বিমল আনন্দ উপভোগ করিবার দিন। আমরা অনেকের সঙ্গেই কোলাকুলী করিয়া পরম প্রীত হইলাম। বিদেশে বিজয়া-উৎসব সত্য সত্যই বড় মধুর। সেবার মিরাটে বিজয়ার দিন দুর্গাবাড়ীতে যে মর্ম্মস্পর্শী ছবি দেখিয়াছিলাম, তাহা বার বার মনে পড়িতেছিল। পূর্ব্বেকার বাঙ্গালীরা উদার ও মহৎ ছিলেন, তাহা না হইলে এমন চমৎকার মিলন-মন্দির গড়িয়া যাইতে পারিতেন না। বর্ত্তমানে নানা গণ্ডগোলে ও নানা মুনির নানা মতে এই সব স্থানের অবস্থা ও ব্যবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছে—ইহা বাস্তবিকই দুঃখের ও লজ্জার কথা।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে চারিদিক ফরসা হইলে আমরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। এদিক-ওদিক বেড়াইতে বেড়াইতে এক পাঞ্জাবী হোটেলে গিয়া কিছু ভাত, রুটি, ডাল, তরকারী ও মাংস খাওয়া গেল। হোটেলটি ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাওয়ার পর মন্দিরে

ফিরিলাম। বারান্দায় উঠিয়া দেখি, সমস্ত সিমলায় যেন উৎসব লাগিয়া গিয়াছে। চারিদিকেই পাহাড়ের গায়ের বাড়ীগুলিতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে যে কি সুন্দর ছবি, তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না। এ যেন সেই—

"একি, দীপমালা পরি হয়েছে রূপসী এ মহানগরী আজি!
একি, নিশীথ পবনে ভবনে ভবনে, বাঁশরী উঠেছে বাজি।
একি, কুসুম গন্ধ সমুচ্ছ্বসিত তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
একি, রূপতরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি॥"

সকালে উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা জেকোর দিকে যাইলাম। এই পাহাড়টি ৮০৪৮ ফিট্ উচ্চ। আমরা পাহাড়টির খানিক উপরে উঠিলাম। নীচের বাড়ী, বাগান, দোকান, বাজার, রাস্তা সবই যেন ছবির মত সাজান'। রাস্তাগুলি খুব পরিষ্কার। সিমলা সহরে কলিকাতার মত অবাধে মোটর গাড়ী, গরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ী চালাইবার নিয়ম নাই। নিকটে ও দূরে পাহাড়গুলির উপর নানা রকমের সুদৃশ্য বৃক্ষ,—সেগুলি দাঁড়াইয়া হেলিতেছে ও দুলিতেছে; তাহার উপর দিয়া সাদা সাদা ছোট ছোট মেঘগুলি খেলিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে ঘন বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া পরিষ্কার আকাশ ও সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আমার জন্মভূমি শান্তিপুরের শ্রদ্ধেয় কবি করুণানিধানের লেখা মনে হইল—

"পটে-আঁকা তরুর শিরে
চূর্ণ কিরণ-পিচকিরী।
শোনো-শোনো তেমনি সুরেই
পাহাড় চূড়ে ডাকছে কে!
ধ্যানের দেশে আছিস্ কে আয়,
আয় রে চলে সব রেখে।"

জেকোর উপরে উঠিবার রাস্তায় এবং আশে পাশে সাহেব ও ধনী ব্যক্তিদের অতি সুন্দর সাজ-সজ্জা পূর্ণ ঘর বাড়ী দেখা গেল। ক্রমে চারিদিকে বেশ রৌদ্র উঠিয়া গেল। আমরা গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলিতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে পাহাড়ের গায়ে নানা রঙের লতা ও ছোট ছোট মনোমুগ্ধকর পুষ্প বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। নির্ম্মল প্রভাতে বৃক্ষশাখায় পাখীরা সুমিষ্ট স্বরে গান ধরিয়া দিয়াছে। কোথাও বা সাহেবদের ছেলেমেয়েরা আমাদের সঙ্গে প্রভাত সমীরণ সেবন করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—তাহারা ছুটাছুটী করিতেছে। প্রকৃতির এই অপার্থিব শোভার মধ্যে এই শিশুগুলির চঞ্চল নৃত্য কি মধুর! এই সব দেখিতে দেখিতে আমরা জেকোর চূড়ায় এক নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বানরের খেলা দেখিতে লাগিলাম। উঁচু পাহাড়ের মুক্ত বায়ু গায়ে লাগিয়া অল্পকাল মধ্যেই আমাদের সব ক্লান্তি দূর হইয়া গেল। সিমলায় সাহেব-মেমেরই ছড়াছড়ি। তাঁহারা দলে দলে হাস্যোজ্জ্বল মুখে নানা ভঙ্গীতে পথ দিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের দেখিলে বোধ হয়, দুঃখ যে কি জিনিষ, তাহা তাঁহারা জানেন না!

সিমলা সহর সমুদ্র হইতে ৭০৮৪ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। বড়লাট লর্ড আমর্হার্ষ্ট ১৮২৭ সালে প্রথমে এখানে গ্রীষ্মকালে বাস করেন। তাঁহার সময় হইতে সকল বড়লাটই গরমের দিনে এখানে বাস করিয়া গরমের হাত হইতে অব্যাহতি পান। পাঞ্জাবের লাট এবং জঙ্গীলাট গ্রীষ্মকালে এইখানে বাস করেন। ভারতের সৈন্য বিভাগের এখানে হেড কোয়ার্টার। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালেই সিমলা বেশী গুলজার হইয়া থাকে। কলিকাতার অনেক বিখ্যাত দোকান এবং হোটেলের শাখা এখানে আছে। দোকানগুলিতে লোকজনের ভীড়েরও অভাব নাই।

পরমেশ্বর এই বিশ্বকে নানা সাজে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। কবি গাহিয়াছেন "এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে, তাই দিয়ে তুমি

সাজায়ে রেখেছ।” হে মানব! তোমার অবসর কালে এই মুক্ত বাতাস, নদ-নদী নির্ঝরের মধুর কলতান, গিরিকন্দরের মন ভুলানো শোভা এবং প্রফুল্ল প্রসূনের প্রাণ মাতানো হাস্য দেখিয়া রূপসাগরে ডুবিতে ইচ্ছা করেনা কি? সমস্ত সিমলা যেন একখানি ফ্রেমে আঁটা ছবি। সিমলার আকাশ বাতাস সবই নূতন রকমের। সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতনে থাকিলে দেহ মনও সরল ও সুন্দর হইয়া যায়। আমাদের সিমলা প্রবাসের কয়েকদিন দেখিতে দেখিতে বেশ কাটিয়া গেল। এখনও কোলাহলময়ী কলিকাতা বা অন্য কোন স্থানে থাকিবার সময় সেই মধুর স্মৃতি-বিজড়িত ছবির দেশের কথা মনে হইলেই ভাবি—

"হে সিদ্ধবর! পাষাণ-অধর
আছ বাণী সংহরি'
শুনাও মানবে আদিম প্রণব
অবনীতে অবতরি';
এসেছি ভিক্ষু অমৃত-ইক্ষু-
রস পান অভিলাষে,
দেখাও সোপান, মহাপ্রস্থান,
চির-ঈপ্সিত পাশে।
কোন্ সে প্রয়াগে নবারুণরাগে
অবগাহনের শেষে,
দাঁড়াব মুক্ত, প্রসাদ-যুক্ত
সত্যানন্দদেশে।"

শ্রীচণ্ডীচরণ দে।

---

# কবিকঙ্কণ-কাব্যে

## বাঙ্গলার বহির্বাণিজ্য-বিবরণ

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের পরিচয় বাঙ্গলার সাহিত্যসেবী মাত্রেই অবগত আছেন। বঙ্গবাণীর অর্চ্চনা করিয়া যাঁহারা অমর হইয়া গিয়াছেন, মুকুন্দরাম তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। মুকুন্দরামের পুরা নাম—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, 'কবিকঙ্কণ' তাঁহার রাজদত্ত উপাধি। আনুমানিক ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার সেলিমাবাদ থানার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই দামুন্যা গ্রামের পরিচয় দিতে গিয়া মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—

"কুলে শীলে নিরবদ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য
দামুন্যায় সজ্জনের স্থান।
অতিশয় গুণ বাড়া, সুধন্য দক্ষিণপাড়া
সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥"

"গঙ্গাসম সুনির্ম্মল তোমার চরণজল,
পান কৈনু শিশুকাল হতে।
সেই তো পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে,
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥"

দামুন্যা পৈত্রিক বাসভূমি হইলেও, কবি এখানে কাব্য রচনার সুবিধা পান নাই। তাঁহার 'চণ্ডীকাব্য' রচিত হয় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূমি পরগণার 'আড়রা' গ্রামে। দামুন্যার তৎকালীন ডিহিদার মামুদ সরিফের নানা অবিচারে তিনি গ্রাম ত্যাগ করিয়া আড়রা গ্রামে চলিয়া যান। আড়রার গুণগ্রাহী ভূস্বামী বাঁকুড়ারায় তাঁহাকে সাদরে

আশ্রয় দান করিয়া নিজ পুত্রগণের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। কবি এই আড়রায় থাকিয়াই তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা করেন।

মুকুন্দরামের রচনা কতখানি সরস, কিরূপ প্রাণস্পর্শী তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই জানেন। শুধু কাব্যরসের দিক দিয়া নহে, ভাবসম্পদের দিক দিয়াও কবিকঙ্কণ-কাব্য বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। সহজ ভাষায় কবিতা পংক্তির মধ্য দিয়া কবি সেকালের যে চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই বিংশ শতাব্দীর উন্নতিকামী বঙ্গ-সন্তানগণের লক্ষ্য করিবার বিষয়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডী কাব্য' বাঙ্গলার সমাজজীবনের ইতিহাস, বাঙ্গালীর ব্যবসা বাণিজ্যের গৌরবকাহিনী, বঙ্গসংসারের নিখুঁত চিত্র, বাঙ্গলার মা-বোনেদের ঘরের কথা। বঙ্গের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কবিকঙ্কণ কাব্যের বিস্তৃত আলোচনায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুকুন্দরামকে অমর রাখিবার জন্য যথোচিত যত্ন করিতেছেন। চণ্ডীকাব্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার জন্য পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

চণ্ডীকাব্য দুই অংশে বিভক্ত; প্রথম কালকেতুর উপাখ্যান, দ্বিতীয়—ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। দ্বিতীয় অংশ অধিকতর ঘটনা-বৈচিত্র্যময় এবং প্রাচীন বঙ্গের বহু কিছু তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। এই কাব্যাংশ অবলম্বনে আমরা সেকালের বাঙ্গালীর বিদেশবাণিজ্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব মাত্র। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি।" —এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। প্রাচীনকে প্রাচীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়া আজ বাঙ্গালী যে নূতনের অভিযানে বাহির হইয়াছে, তাহা তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, কে জানে? বাঙ্গালী এককালে যে কাঙ্গাল ছিল না, তাহার যে ধনসম্পদ ও শিল্পবাণিজ্য ছিল—ইহা স্বীকার করিতে অনেকে নাসিকা কুঞ্চন করেন; অবজ্ঞা-

ভরে তাঁহারা বলেন—'সেকালে কি ছিল না-ছিল তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই ; এখন যাহা করিবার তাহাই করিয়া যাও, 'সেকাল' 'সেকাল' বলিয়া চীৎকার করিয়া লাভ কি ?' তাহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই,—অতীতের গৌরবই আমাদের ভবিষ্যতের নবীন সৌধ নির্ম্মাণের ভিত্তি হউক, অতীত-ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলিই আমাদের নবযাত্রার পথে শক্তি সঞ্চার করুক।

প্রাচীন বঙ্গের বাণিজ্য-বিবরণ কবিকঙ্কণ দিয়াছেন। উজানীর শাসনকর্ত্তা বিক্রমকেশরী শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে বহু বিত্তশালী বণিক ও সদাগর বাস করিতেন। ধনপতি সদাগর ইঁহাদেরই মধ্যে একজন খ্যাতনামা ধনী ব্যবসায়ী। উজানীর রাজভাণ্ডারে চন্দন, শঙ্খ, মতি, প্রবাল, চামর ইত্যাদি দ্রব্যের অভাব হইয়াছে, এই সব দ্রব্য সিংহল হইতে আমদানী করিবার জন্য রাজা বিক্রমকেশরী সদাগরশ্রেষ্ঠ ধনপতিকে আদেশ প্রদান করিলেন। রাজানুগ্রহে পুষ্ট ও রাজদত্ত সম্মানে ভূষিত সদাগর এ আদেশ সানন্দে গ্রহণ করিলেন। রাজা শুধু আদেশ দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, তাহার সঙ্গে—

"আপন অঙ্গের জোড়া, চড়িবারে দিল ঘোড়া,
কবচ, প্রসাদ, ধনাধার।"

ইহা হইতে সহজেই বোঝা যায়, বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তাগণ সেকালে দেশের বণিকদের কি চক্ষে দেখিতেন। অতঃপর বিক্রমকেশরী সদাগরকে বিদায় দিতেছেন—

"সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা দিল আলিঙ্গন।
ভাই বলে কোল দিল পাত্র মিত্রগণ॥
সবার করিল সাধু চরণ বন্দন।
ভাণ্ডারী আনিয়া তঙ্কা দিল ততক্ষণ॥

লক্ষ তঙ্কা গুণে দিল ডিঙ্গার সাজন।
বিদায় লইয়া সাধু গেল নিকেতন॥"

বাণিজ্য-যাত্রার গৌরব সেকালের বাঙ্গালী বুঝিত। পরের চাকরী করিয়া নিতান্ত একঘেয়ে ভাবে জীবনযাপন করিবার চিন্তা তখনো তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। মান-অপমানের গণ্ডী কাটাইয়া, সামান্ত সামান্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও সেকালের বাঙ্গালী স্বাধীনভাবে বাঁচিবার চেষ্টাই করিত। এজন্যই তখন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ছিল যথোপযুক্ত ধনসম্পদ, বাঙ্গালীর দেহে মনে ছিল অদম্য শক্তি সাহস,—বাঙ্গালী ছিল একটি জাগ্রত জাতি। দিনক্ষণ নাই, পাঁজিপুঁথি দেখা নাই, সুযোগ পাইলেই ছুটিয়া বাহির হইতে হইবে—ধনোপার্জ্জনের পথ আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে—ইহাই যে এক সময় বাঙ্গালীর সাধনা ছিল, তাহার পরিচয় মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের রচনা হইতে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ধনপতি সদাগর সিংহলে বাণিজ্যযাত্রা করিবেন, উজানী নগরে 'সাজ' 'সাজ' রব পড়িয়া গিয়াছে। সদাগরের বিদেশ যাইবার উপযোগী যথেষ্ট ডিঙ্গা ছিল। এ ডিঙ্গা তালের ডোঙ্গা বা 'পান্‌সি' নহে—এগুলি ছিল তরঙ্গসমাকুল নদনদী ও সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিবার উপযোগী সুদৃঢ় মাস্তুল ও পালসংযুক্ত বড় বড় 'সওদাগরী' নৌকা। বাঙ্গালী শিল্পী, বাঙ্গালী কারিকর বাঙ্গলার কাঠ দিয়া এইগুলি নির্ম্মাণ করিত। নৌবিদ্যা-বিশারদ বাঙ্গালী নাবিকই এই সব নৌকা সিংহল, সুমাত্রা, যাভা, বালীদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে লইয়া গিয়া দেশের বহির্বাণিজ্যের সহায়তা করিত। বাঙ্গলার বণিক এই প্রকার বাণিজ্যে প্রচুর ধনসম্পদ ও দেশের আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া জয়মণ্ডিত শিরে ঘরে ফিরিত।

ধনপতি সদাগরের ডিঙ্গা গোছান হইতেছে—

"পূর্ব্ব হইতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবরী লইয়া সাধু গেল তার কূলে॥
ঘাটে জলদেবতার করিল পূজন।
জলেতে ডুবরী গিয়া নামে দুইজন॥
প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নাম মধুকর।
সুবর্ণে নির্ম্মাণ সে ডিঙ্গার ছৈ-ঘর॥
আর ডিঙ্গা তোলে তার নাম দুর্গাধর।
আখণ্ডল প্রায় তাহে বৈসে সদাগর॥"

এই প্রকারে সদাগরের সাতখানি ডিঙ্গা তুলিয়া জলে ভাসান হইল। তারপর—

"মোম ধূনা দিয়া যে গাইল সাত নায়।
ত্বরিত গমনে ডিঙ্গা সাজন করায়॥
সাতখান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বাঁধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে॥
অবিলম্বে সদাগর আসে নিকেতন।
ভাণ্ডার ভিতর সাধু দিল দরশন॥
জোয়ের মোহর তার ছবি উতারিয়া।
কাঠায় করিয়া ধান নিলেন মাপিয়া॥"

অগ্রগতিই যে বাঙ্গালীর চরম লক্ষ্য ছিল—তাহার প্রমাণ মুকুন্দরাম দিয়াছেন। সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সকল প্রকার সংস্কার কাটাইয়া জয়লাভের জন্য ছুটিয়া যাইতেই হইবে। সদাগরের মন ছুটিয়াছে—বহির্বাণিজ্যে বাহির হইবেন, কিন্তু তিনি বাধা প্রাপ্ত হইলেন সহধর্ম্মিণী খুল্লনার নিকট। খুল্লনা বলিতেছেন—

"প্রাণনাথ সিংহল গমনে নাহি সাধ।
ঘরের চন্দন শঙ্খ দিয়া হও নিরাতঙ্ক,
রাজ-স্থানে পাইবে প্রসাদ ॥
ভাণ্ডারে আছয়ে নীলা রসান নিকর শীলা
মাণিক বিদ্রুম মরকত।
আছে যত নিজাগারে দেহ ল'য়ে নরবরে,
সুখে থাক জায়া অনুগত ॥"

খুল্লনা কি শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন? ধনপতি যখন একান্তই যাইবেন স্থির করিয়া ফেলিলেন, তখন খুল্লনা পথের আপদ-বিপদের কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন—

"জলে কুম্ভীরের ভয় কূলে শার্দ্দুলের চয়,
দুষ্ট খণ্ড শত শত পথে।
যে যায় সিংহল দেশ সে পায় অনেক ক্লেশ,
কহিল আমার পিতা তত্ত্বে ॥
যাইবে সদাগর বেয়ে, সে পথে নাহিক নেয়ে,
পরাণ শঙ্কট সে হারায়।
শুনিতে পরাণ ফাটে মকরে মানুষ কাটে,
ধিক্ ধিক্ সিংহল উপায় ॥
বহু তিমি তিমিঙ্গিল আছে প্রাণী প্রতি স্থল
তনু যার শতেক যোজন।
কিবা সে টমক সিঙ্গা, পক্ষী ছুঁয়ে লয় ডিঙ্গা,
সেই দেশে শঙ্কট জীবন ॥"

ইহাতেও সদাগর নিরস্ত নন। অতঃপর খুল্লনার উদ্যোগে পঞ্জিকা দেখিয়া দিনস্থির করণের পালা—

"গণনা করিল ওঝা মন করি সার।
অবধান কর সাধু যাত্রা নাহি আর॥"

কে কাহার কথা শোনে? ধনপতি অচল, অটল; কোন বাধা-বিঘ্নই তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিতেছে না। ইহার পর কবিকঙ্কণ আমাদিগকে জানাইতেছেন—

"পথে যাইতে সদাগর লাগিল উচ্ছটা।
নেতের আঁচলে লাগে সেয়াকুল কাঁটা॥
যাত্রার সময় ডোমচিল উড়ে মাথে।
কাঠুরে কাঠের ভার লয়ে যায় পথে॥
শুকান ডালেতে বসি কু বোলয় কাউ।
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা আধখানি লাউ॥
কচ্ছপের ঝোলা ল'য়ে ধীবরেরা যায়।
তৈল ল'য়ে তেল নিবে কলুরা বেড়ায়॥
চলিলেন সদাগর হয়ে কুতূহলী।
বামদিকে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী॥"

অবশেষে—

"ভ্রমরার ঘাটে সাধু দিল দরশন।"

এইবার কবিকঙ্কণ ধনপতি সদাগরের যাত্রাপথের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। উজানী হইতে সিংহল প্রভৃতি দেশে যাইতে হইলে যে পথে যাইতে হয়, কবি তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"দেব দ্বিজ গুরুজনে করি নমস্কার।
হরি হরি বলি ডিঙ্গা বাহে কর্ণধার॥
লহনা খুল্লনা ঠাঁই মাগিল মেলানি।
বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥

ভাগুসিংহের ঘাটখান ডাহিনে রাখিয়া।
মেটারির ঘাটে যায় বামে তেয়াগিয়া॥"

*

"ত্বরা করি সদাগর রাত্রিদিন যায়।
পূর্ব্বস্থলী সদাগর বাহিয়া এড়ায়॥
কোথাও রন্ধন কোথা দধি খণ্ড কলা।
নবদ্বীপে উত্তরিল বেণিয়ার বালা॥
চৈতন্য চরণে সাধু করিল বন্দন।
সেখানে রহিয়া কৈল রন্ধন ভোজন॥"

*

"নায়ে পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল পুরী অম্বিকা মুলুক॥
বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
শান্তিপুর বামেতে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া॥"

ক্রমে ফুলিয়া, হালিসহর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইয়া বাঙ্গলার সোনার ছেলে ধনপতি সদাগরের বাণিজ্য-ডিঙ্গা সমুদ্র মুখে উপনীত হইল। সেখানে—

"দুই এক তরণী জলের মধ্যে ভাসে।
মগরার কথা সাধু মাঝিরে জিজ্ঞাসে॥
দূরে শুনি মগরার জলের নিস্বন।
যেন আষাঢ়ের নব মেঘের গর্জ্জন॥
মোহানা বলিয়া সাধু যেতে কৈল ত্বরা।
প্রবেশ করিল সাধু দুর্জ্জয় মগরা॥

এইবার মগরার দুর্য্যোগের কথা। এই দুর্য্যোগের বর্ণনা সত্যই অন্তরকে কাঁপাইয়া দেয়। মুকুন্দরাম এই স্থলে ধনপতি সদাগরের

যথেষ্ট সাহস ও মনোবলের পরিচয় দিয়াছেন। এখানকার বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

"ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দূর দূর॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুসলের জল॥
নদীজলে বৃষ্টিজলে উথলে মগরা।
কূল যুড়ে বহে জল একাকার ধারা॥"

*

"দিবানিশি সম চারি মেঘের গজ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥"

*

"ছৈঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদমাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥"

ইহার পর কবি আরও নানা আপদ-বিপদের উল্লেখ করিয়াছেন; ক্রমে চণ্ডীর কৃপায় সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া ধনপতি সদাগর সিংহলে উপনীত হইলেন।

"গৌজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।
বাদ্য করি সদাগর উঠিলেন কূলে॥"

এসময় সিংহলের বাণিজ্যপোত বাঁধা হইত 'রত্নমালার ঘাট' নামে একটি বন্দরে। এই রত্নমালার ঘাটে সদাগরের ডিঙ্গা বাঁধা হইল। বাদ্যধ্বনি এবং পাইক, বরকন্দাজ ও মাঝিমাল্লাদের আনন্দ-কলরোলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিল।

"রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্রে চমকিত হইল নৃপমণি॥"

ধনপতি সদাগর সিংহল-রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছেন—

"করি অবগতি শুন নরপতি
গৌড়দেশে মোর বাস।
বিক্রমকেশরী সাজি সাত তরী
পাঠাইল তব পাশ॥"

*

"গন্ধবেণে জাতি উজানীতে স্থিতি
দত্তকুলে উৎপত্তি।
অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
বসি, নাম ধনপতি।"

তখনকার দিনে বণিকগণ কোন্ কোন্ দ্রব্য বিদেশে লইয়া যাইতেন এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য এদেশে আমদানী করিতেন, কবিকঙ্কণ তাহার এক বিস্তৃত তালিকা এইস্থলে দিয়াছেন। যদিও এই তালিকা অনেকখানি অতিরঞ্জিত, অনেকখানি কাব্যরস-মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্য লিখিত, তথাপি বলিতে হইবে যে, এই তালিকা হইতে সেকালের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক-কিছু ধারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিংহলরাজের নিকট ধনপতি সদাগর বলিতেছেন—

"লবঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে বঙ্গ দিবে
শুন্ঠীর বদলে টঙ্ক॥"

"সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব
গুঞ্জার বদলে পলা।

পাট শণ বদলে ধবল চামর
কাচের বদলে নীলা ॥"

*

"চৈয়ের বদলে চন্দন দিবে
পাগের বদলে গড়া।
শুকুতার বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥"

ধনপতি সদাগরের তালিকা অনুযায়ী—

"বদলের সজ্জা রাজা কৈল অঙ্গীকার।
শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যাভার ॥
সাধুকে তুষিল রাজা কুসুম চন্দনে।
বিদায় করিল হেসে রন্ধন ভোজনে ॥"

চণ্ডীকাব্যের ইহার পরবর্তী অংশকে ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার দ্বিতীয় অংশ বলা যাইতে পারে। এই অংশে সিংহলে ধনপতি সদাগরের বিপদ, কমলে কামিনী বর্ণন, ধনপতির কারাবরণ, পরিশেষে চণ্ডীর দয়ায় উদ্ধার ইত্যাদি বহু ঘটনার বিবরণ মুকুন্দরাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সে-সবের উল্লেখ না করিয়া ধনপতি সদাগরের পুত্র শ্রীমন্ত সদাগরের সমুদ্রযাত্রার একটু বিবরণ এই স্থলে উল্লেখ করিয়া আমরা এই আলোচনা শেষ করিব।

পিতা সিংহলে বন্দী—দ্বাদশ বৎসরের বালক শ্রীমন্ত সমুদ্রযাত্রা করিয়া পিতার উদ্ধার সাধন করিবেন—এই সঙ্কল্প জননী খুল্লনা সমীপে জ্ঞাপন করিলেন। খুল্লনা মা,—মা হইয়া দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে সিংহলের পথে ছাড়িয়া দিবেন—ইহা কি সম্ভব? তিনি কাঁদিয়া-কাটিয়া বহু নিষেধ করিলেন—শ্রীমন্ত কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তিনি একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলেন—

"দেহ মোরে আছে যত ধন।
বাপের উদ্দেশ আশে চলিব সিংহল দেশে
সাত ডিঙ্গা করিয়া সাজন॥"

খুল্লনা জানাইলেন, ধনপতি সদাগর সাত ডিঙ্গা লইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর ত ডিঙ্গা নাই। তেজস্বী বালক নূতন ডিঙ্গা তৈয়ার করিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

"দুন্দুভি বিশাল বাদ্য বাজায় বাজনা।
কোটাল সাধুর বোলে দিলেক ঘোষণা।
ঝাট্ আসি সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ।
শত পল স্বর্ণ দিব ইথে নাহি আন॥"

অল্প সময় মধ্যেই ডিঙ্গা প্রস্তুত হইল। রাজা বিক্রমকেশরী প্রথমে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্ত যখন বলিলেন—

"পিতার উদ্দেশে যাব দক্ষিণ পাটন।
ইথে যদি মৃত্যু হয় পাব নারায়ণ॥
দেহ অনুমতি রায় দেহ অনুমতি।
পিতার উদ্দেশে আমি যাব শীঘ্রগতি॥"

তখন—

"শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি দেখিয়া নৃপতি।
ধন্য ধন্য বলি তায় দিলা অনুমতি॥
অঙ্গ হইতে খসাইয়া দিল খাসা যোড়া।
চড়িবারে দিল তারে পাহাড়িয়া ঘোড়া॥
আরোপিল অঙ্গে তার ভূষণ চন্দন।
লক্ষ তঙ্কা দিল তারে ডিঙ্গার সাজন॥"

কিন্তু জননী খুল্লনা আর একবার নিষেধ করিয়া বলিলেন—

"সিংহলের কথা শুনি বড় লাগে ত্রাস।
যেজন সিংহলে যায় নাহি আইসে বাস॥"

মায়ের মনোকষ্টের কথা শ্রীমন্ত বুঝিলেন। জননীকে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিলেন—

"চলিব পাটনে মাতা ইথে নাহি আন।
যাত্রাকালে অমঙ্গল কথা অকল্যাণ॥
মনের হরিষে মাতা স্থির কর মতি।
তুয়া পুণ্যফলে দেশে আসিবে শ্রীপতি॥"

পুত্রের এবম্প্রকার পিতৃভক্তি, সমুদ্রযাত্রার এই অদম্য ইচ্ছা, সর্ব্বোপরি দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের তেজোদীপ্ত আনন দেখিয়া মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া গেল। পুলকাশ্রু দুই চক্ষু বহিয়া বক্ষ ভাসাইয়া দিল। বাঙ্গলার মেয়ে, বাঙ্গালী ঘরের বউ, বাঙ্গালী জাতির মা—প্রাণপ্রিয় সন্তানকে সমুদ্রযাত্রায় অনুমতি দিলেন। উজানী নগরে আবারা 'সাজ' 'সাজ' রব পড়িয়া গেল। যথাসময়ে শ্রীমন্তের সাত ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে ভাসিল। তখন খুল্লনা—

—"বিদায় দিলেন পুত্রে হরষিত মনে॥
অভয়ার পূজা রামা কৈল আরম্ভন।
ষোড়শোপচারে আনে পূজার কারণ॥
সঙ্গে এয়োগণ এল ভ্রমরার ঘাটে।
পূজার আরম্ভ করে সেই নদী তটে॥
চন্দনের অষ্টদল করিয়া সুন্দরী।
তার মাঝে স্থাপিলেন কণকের ঝারি॥
চারিদিকে জয় জয় দেয় রামাগণ।
লোকে বলে ধন্য ধন্য বেণের নন্দন॥"

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীকাব্য' উপাখ্যান হইলেও ইহার একটি ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। দেশ, সমাজ, জাতি ও ধর্ম্মের সকল

অবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই কবিগণ কাব্য রচনা করিয়া থাকেন। কবিকঙ্কণের রচনা সুমধুর কাব্য হইলেও, বাঙ্গলার অতীত ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের বিবরণই ইহার মধ্য দিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায় বলা যায়, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ বাঙ্গলার অমর কবি এবং তাঁহার রচিত কাব্য বঙ্গবাণীপূজা-মন্দিরের অমূল্য উপচার। বাঙ্গলা দেশকে চিনিতে হইলে, বাঙ্গালীর অতীত গৌরবেতিহাস জানিতে হইলে, বাঙ্গলার সাহিত্য ও কাব্যসম্পদের অফুরন্ত রসধারা পানে তৃপ্ত ও শান্ত হইতে হইলে 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' গ্রন্থখানি পাঠ করা বাঙ্গালী পাঠক প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

---

# বাণী-বিতান

## যাত্রা হ'লো সুরু

যাত্রা হ'লো সুরু।

বৈশাখের রুদ্রমেঘ ঘনায় গগনে,
মুরছিচে ফুলদল কানন গহনে;
স্তব্ধ পশু পাখী, মূক সমগ্র বনানী,
আসন্ন প্রলয়বার্ত্তা রুদ্রকণ্ঠে শুনি।
সন্ন্যাসী বৈশাখ ওই লইয়া ডম্বরু
বাজায় আকাশপথে গুরু গুরু গুরু,
—যাত্রা হ'লো সুরু।

যাত্রা হ'লো সুরু।

সুরু হলো যাত্রা তাই আকাশ বাতাসে,
ধ্বনিছে কাহার কণ্ঠ অশান্ত উচ্ছ্বাসে
বাঁধহারা উন্মত্ত প্রলয় বিষাণে
প্রকৃতির কাণে কাণে গভীর গর্জ্জনে;
মুখরি অম্বরপথ—শিহরিয়া তরু,
গগনে তাহারি ভেরী বাজে গুরু গুরু;
—যাত্রা হ'লো সুরু।

শ্রীগৌরচন্দ্র পাল।

# কৃত্তিবাস *

এই কি গো সেই সাধু মনীষির লীলাক্ষেত্র
সুবিখ্যাত নদীয়ার মহাতীর্থ ভূমি,
পতিত পাবনী গঙ্গা সুগম্ভীর কলনাদে
ছিলা প্রবাহিত যার শ্রীচরণ চুমি।
আদিকবি বাঙ্গলার বসি এরই তরুতলে
রচেছিল সুমধুর রামায়ণী কথা,
সুধামাখা মধুস্বরে ঝঙ্কারিত প্রতি ঘরে
আজও সেই অতীতের পুণ্যময় গাথা।
সুশীতল শ্যামছায়ে, একা বসি সান্ধ্যবায়ে
হে কবি মধুর স্বরে বাজালে যে বীণ,
বিধির বিধানমতে নিঠুর কালের স্রোতে
কোথা ভেসে চলে গেছে অতীত সে দিন।
নিভে গেছে ধ্রুবতারা, ভেঙ্গে গেছে স্বর্ণচূড়া,
শুকায়েছে মালঞ্চের প্রস্ফুটিত ফুল,
নীরব হয়েছে পিক, গন্ধ দানি চারিদিক্
পুষ্পরাণী কুঞ্জমাঝে দোলে না দোদুল।
ওহে কবি কৃত্তিবাস, পূরাও মনের আশ
এই ভিক্ষা আজি মোরা মাগি বারম্বার,
ভক্তি অর্ঘ্য শতদলে পূজিব চরণতলে,
লহ দেব সকলের প্রীতি নমস্কার।

শ্রীসুধীরঞ্জন প্রামাণিক।

---

* কৃত্তিবাস-স্মৃতিপূজা উৎসব-সভায় পঠিত।

# স্বখাদ-সলিল

লিখবো ব'লে ভাবছি বটে লিখবো কি ছাই বল্‌তে পারো!
দেশ ত' হ'লো বেকার বোঝাই, সমস্যাটা জটিলতর।
প্রথম ভাগের প'ড়ো থেকে নাগাৎ দেখো বি-এ, এম এ,
পায় না কেহই চাকরী আজি, জীবন-লক্ষ্য তাহার এযে।
কলের কাছে মনের কাছে জাতব্যবসা হারিয়ে আজ,
চাক্‌রী পানে তাকিয়ে আছি, পরেছি সব "ভদ্র সাজ!"
জীবনযাপন-প্রণালীটাও বদল ক'রে দিইছি এমন
পাইনে ভেবে পিতামহ করতো কিসে জীবন ধারণ।
গর্ব্ব ক'রে আমরা বলি—মূকের মুখে দিইছি ভাষা,
"হরিজনের" আন্দোলন তাই উঠছে দেখ কেমন খাসা!
"আভিজাত্যের" মাপকাঠিতে সবাই বড় হচ্চে ভাই,
অন্য দেশের কর্ম্মী তাদের কর্ম্মক্ষেত্রে নিচ্চে ঠাঁই।
"অন্তঃপুরের অন্ধকারে অত্যাচারের পাষাণ চাপে"
যাপত' জীবন, দায় হ'য়েছে আজকে টেকা তাদের দাপে।
অন্তঃপুরের শান্তি গেছে আকাঙ্ক্ষারই আগুন লেগে,
"সভ্য" মোরা হচ্ছি বলে, আছি মনের আগুন চেপে!
ঘর হ'য়েছে বাহির এখন, বাহির ক্রমেই হচ্চে ঘর,
পরকে আপন করতে নারি, আপন কিন্তু হচ্চে পর।
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতায় সাম্প্রদায়িক উঠলো ঝড়,
এইখানেতেই 'ইতি' করি বুদ্ধি ক্রমেই হচ্চে জড়।

শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন।

# একটি পিতৃমাতৃহীন মেয়ের প্রতি

ঐ ওপারে বাড়ী আমার, ওপারেতে ঘর,
দীঘির ধারে ছোট্ট কুঁড়ে ঘর ;
এ পারেতে আসি আমি প্রতি হাটের দিনে
করতে বেচাকেনা,
কিছু কিছু জানাশোনা
আছে আমার এ পারেতে ; যাবে তুমি আমার সাথে ?
থাকৃবে তুমি আমার বাড়ী, খেলবে আমার ছেলের সাথে ;
কান্না কিসের. ছি !
কাঁদ্‌তে আছে কি ?
সে ব'ললে কাতর স্বরে—
এমন ক'রে
আদর আমায় কেউ না করে,
দুঃখ কিন্তু হয় না আমার তাতে,
বেদনাতে
চোখের কোণে আসেনাক' একটি ফোঁটাও জল.
তোমার স্নেহ করলে আমায় দুঃখেতে চঞ্চল ;
তোমার কথা শুনে
মায়ের স্মৃতি প'ড়ছে আমার মনে,
যাব, যাব তোমার সাথে, যাব তোমার ঘর ।

শ্রীসত্যরঞ্জন দাশ ।

# স্মৃতিপূজা *

নিখিল দেশের উজল প্রদীপ, কৃতী সন্তান কোথায় আজ !
বিশাল শূন্যে লইলে বিদায় হে শত-হৃদয়রাজাধিরাজ !
সেবাব্রতের ত্যাগী সন্ন্যাসী, সত্য ন্যায়ের সাধক বীর,
দেশবাসীদের বক্ষ ভাঙ্গিয়া বহালে সবার নয়নে নীর।
নররূপে তুমি আসিয়া ধরায় নিয়ত নীরবে করেছ দান,
সকল কাজের অগ্রণী ছিলে, ছিলে যে 'বন্ধুসভা'র প্রাণ।
অনাবিল প্রেম, স্নেহ, দয়ামায়া ছিল যে তোমার হৃদয়ে গাঁথা,
দীনদুখীদের ক্রন্দনে তুমি তাই বুঝি পেতে সদাই ব্যথা !
অতুল স্বাস্থ্য এনেছিলে সাথে, অশিতি বর্ষ বয়স পরে,
নিত্য প্রভাতে ক্রোশব্যাপী পথ ফিরিতে গো তাই ভ্রমণ করে।
গীতা ভাগবত বেদ পুরাণের পণ্ডিত ছিলে,—সবাই জানে,
তত্ত্বের কথা শোনায়েছ কত, ছোট বড় জনে সরল প্রাণে।
প্রচার করেছ দেশের বুকেতে – সেবাধর্ম্মই ধর্ম্ম—সার ;
সত্য পথের মহান্ যাত্রী, লহ আমাদের নমস্কার।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দালাল।

# আশা

অয়ি কুহকিনী আশা, ধন্য তব ভালবাসা !
মানবে প্রলুব্ধ কর থাকিয়ে গোপনে ;
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাসে, অসার জীবন বহে,
তবু নব কল্পনার উৎস দাও মনে।

---

* ৺কীর্ত্তিচন্দ্র রায় মহাশয়ের শোকসভায় পঠিত।

মুমূর্ষু মানব-প্রাণে বিস্তারিয়া মায়াজাল,
সংসার-আবর্ত্ত মাঝে রাখিবারে চাও ;
ক্ষণকাল পরে যার হইবে অস্তিত্ব লোপ,
তার সাথে লুকোচুরি কেন বা খেলাও ?
অয়ি কুহকিনী আশা, ধন্য তব ভালবাসা !
বীর-শিশু রণে যায় করি আস্ফালন ;
ভাবে না মরণ তার, শত্রু-হস্তে ঘটিবার,
যুদ্ধক্ষেত্রে যার অসি খেলে অনুক্ষণ !
সংসার-সমরাঙ্গনে, যুবা-বৃদ্ধ সর্ব্বজনে,
নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলি এইক্ষণে,
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ, নানা কাজে হয়ে লুব্ধ,
বিচরিছে ধরা মাঝে দ্রুত পরক্ষণে।
জন্মিলে মরিতে হবে, দেহ স্থির নহে ভবে,
তথাপি মানব-মনে জাগাও ভরসা ;
নিত্য নিত্য নানা কাজে, ব্রতী কর নানা সাজে,
অন্তিম সময় এলে মিটেনা পিয়াসা।
দুর্ব্বল মানব মনে বসি তব সযতনে
যদি না ঘটিত, তবে পলাত নিশ্চয়—
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞান-দেবী, ছাড়িয়ে আবাস, ভাবি
উন্মত্ততা-ব্যাঘ্র এসে করে পরাজয়।
যাহার অদৃশ্য পটে থাকি তুমি সর্ব্বঘটে,
মনোমন্দিরের শোভা করিছ বর্দ্ধন ;
তিনি বিশ্ব পালয়িতা, সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্তা,
প্রণমি তাঁহার পদে মঙ্গল কারণ।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বিশ্বাস।

# গৌরচন্দ্র *

## ( গীত )

গৌর আমার সর্ব্বস্ব ধন, গৌর মূলাধার ;
গৌর আমার তিলক মালা,
গৌর আমার কণ্ঠের হার ।
পথে যবে চলি গৌর বলি,
নৃত্য করি দু'বাহু তুলি
( আমার ) গায়ে গৌর-নামাবলী
গৌর নাম করেছি সার ।
গৌর প্রেমে প্রেমিক হব,
তৃণ হ'তে তৃণ হব—
পথের ধূলায় প'ড়ে রব,
বিহারী কয় ভ'জলে গৌর
ভবের ভাবনা কিসের আর

শ্রীবিহারীলাল প্রামাণিক ।

* এই গানটির লেখক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল প্রামাণিক মহাশয়ের বয়স বর্ত্তমানে আশি বৎসরের উপর। ইনি একজন খ্যাতনামা বস্ত্রশিল্পী এবং ঐ শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে নিজের বহু সময় ও শক্তি প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। লেখাপড়া অল্প জানিলেও, যৌবনকাল হইতে ইনি বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। ছড়া বাঁধা, 'পালা' তৈরী করা, গান রচনা করায় ইনি বিশেষ পারদর্শী। ইঁহার বহু মধুর রচনা অযত্নে পড়িয়া ছিল, আমাদের একান্ত অনুরোধে ইনি সেগুলির সংস্কার সাধন করিতেছেন। এই গ্রাম্যকবির একটি গান এবারকার "বার্ষিকী"তে প্রকাশ করা হইল, ভবিষ্যতে আরও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।—সম্পাদক।

# সন্ধ্যা

দিনের আলো নিভে গেল, ডুবল সোনার রবি,
জোনাকীদল তরুর শিরে সাজায় যেন ছবি।
সিঁদূর বরণ সূর্য্য-কিরণ পড়ল যেমন স'রে,
ঝিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌ল তারা আকাশখানি ভ'রে।
মোহন রূপে উজল ক'রে চাঁদ উঠিল ধীরে.
বাইরে যারা ছিল, তারা আসল ঘরে ফিরে।
আসল নিশা, স্তব্ধ হল দুষ্ট ছেলের দল,
পাতায় পাতায় জ্যোছ্‌না খেলে,—সোনার শতদল।

শ্রীঅবনীমোহন প্রামাণিক।

---

# শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

## —১৯শ বর্ষ—

[ সন ১৩৪০ সালের কার্ত্তিক হইতে সন ১৩৪১ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত ]

**প্রতিষ্ঠা**—সন ১৩২২ সালের ৮ই কার্ত্তিক শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে শান্তিপুর-রামনগর পল্লীর কয়েকটি মাতৃভাষানুরাগী বালক ও যুবক "হরিহর লাইব্রেরী" নামে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। মাত্র সাত মাসের অভিজ্ঞতায় ইঁহারাই আপনাদের সঙ্কল্পের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া "শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদ্" গঠন করেন। সন ১৩৪০ সালের ৮ই কার্ত্তিক পরিষদ্ ১৯শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

**গ্রন্থাগার**—একটি জীর্ণ পুস্তকাধার, ৬৭খানি পুরাতন বাঙ্গলা পুস্তক এবং ৪খানি সাময়িক পত্রিকা লইয়া পরিষদের গ্রন্থাগারের কার্য্য আরম্ভ হয়। ভগবৎকৃপা, পরিষদের সভ্যবৃন্দের ঐকান্তিক যত্ন এবং শান্তিপুরবাসী সহৃদয় জনগণের সাহায্যসহানুভূতিতে ইহার অনেকখানি পুষ্টিসাধিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে পরিষদের পুস্তকসংখ্যা ছিল ২১০৭খানি, এবং পাঠকগণের জন্য বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকাগুলিই নিয়মিত লওয়া হইয়াছে। গ্রন্থাগারের পুষ্টিসাধনের জন্য যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি পুস্তক ও পত্রিকাদি দান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

**সভ্য সংখ্যা**—আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পরিষদের সভ্যসংখ্যা ছিল ৬৪ জন, ৭জন বাড়িয়া বর্ষশেষে ৭১ জন হইয়াছে। শান্তিপুরের মত জনবহুল দেশের সাহিত্য-পরিষদের এরূপ সভ্যসংখ্যা যে অতি

নগণ্য— তাহা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে আমরা দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের, বিশেষ করিয়া যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মাসিক মাত্র ৶০ আনা সাহায্য করিয়া দেশের এই শুভ প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখার দায়িত্বটুকু, আশা করি অনেকেই গ্রহণ করিতে পারেন।

**স্মৃতিরক্ষণ, সাহিত্য-সংরক্ষণ, পুথি ও চিত্রশালা**—ইতিপূর্ব্বে পরিষদ্ শান্তিপুরের পরলোকগত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহাদের রচিত পুস্তকাবলীর প্রায় অধিকাংশই সংগ্রহ করিয়াছেন। আলোচ্য-বর্ষেও এ সম্পর্কে অনেকগুলি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। একখানি প্রাচীন পুথি, নয়খানি প্রাচীন পঞ্জিকা, কয়েকটি প্রাচীন তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা, কয়েকখানি প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য্যশোভিত ইট কখণ্ড এই বর্ষে পরিষদ্ সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৺রামকৃষ্ণ দাস, ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺সীতানাথ ভবানী, ৺ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শান্তিপুরের কৃতী সন্তানগণের চিত্র পরিষদে সযত্নে রক্ষিত আছে। পরিষদের এই বিভাগের জন্যও আমরা শান্তিপুরবাসী ভদ্রমহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শান্তিপুরের বহু বাড়ীতে মৃত সাহিত্যিক ও মনীষিবৃন্দের হস্তলিপি, রচিত গ্রন্থ, ফটো, সংগৃহীত পুস্তকাদি অযত্নে বিনষ্ট হইতেছে,—এ সংবাদ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এগুলিকে রক্ষা করিবার ভার কি সাহিত্য পরিষদ্ পাইতে পারেন না? আশা করি, দেশবাসী এ বিষয়ে একটু অবহিত হইয়া সাহিত্যসাধনার প্রাচীন ক্ষেত্র এই শান্তিপুরে একটি আদর্শ বাণীমন্দির গঠনে আমাদের সহায়তা করিবেন।

**'শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদ-বার্ষিকী' প্রকাশ**—আলোচ্যবর্ষের শেষভাগে (২৮শে আশ্বিন, ১৩৪১) পরিষদ্ 'শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদ্-বার্ষিকী' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষদের মাসিক

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ কবিতাবলীর মধ্যে চব্বিশটি লেখা এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের ১১শ বর্ষ হইতে ১৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত আট বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে এই গ্রন্থখানিকে শান্তিপুরের সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

**সভার অধিবেশন**—আলোচ্য বর্ষে পরিষদে মোট ২০টি সভার অধিবেশন হইয়াছে, ইহার মধ্যে ১৯শ বার্ষিক জন্মোৎসব-সভা ১টি, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের সভা ২টি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব-সভা ১টি, মহাকবি কৃত্তিবাস-স্মৃতিপূজা-উৎসব সভা ১টি, রামমোহন রায় শতবার্ষিকী সভা ১টি, শোকসভা (কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ও মৌলভী মোজাম্মেল হক্ সাহেবের পরলোকগমনে) ২টি, এবং মাসিক অধিবেশন "পূর্ণিমা সম্মিলন"-সভা ১২টি।

**আয়-ব্যয় বিবরণ**—নিম্নে পরিষদের ১৯শ বর্ষের আয়ব্যয়ের হিসাব প্রদত্ত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অনুপাতে এবার আয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় পরিষদকে অনেকখানি আর্থিক কষ্টে পড়িতে হইয়াছে। আর্থিক অনটনবশতঃ এবার আশানুরূপ পুস্তকাদি ক্রয় করা যায় নাই। শুধু তাহাই নহে, "বার্ষিকী" মুদ্রণ ইত্যাদির জন্য কিছু টাকা কর্জ্জও গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যে সকল সভ্য মাসিক চাঁদা দ্বারা এবং যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি এককালীন দান দ্বারা পরিষদকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটি পরিষদকে মাসিক ১৲ (এক টাকা) হিসাবে সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য মিউনিসিপ্যাল-কর্ত্তৃপক্ষগণ পরিষদের ধন্যবাদভাজন। এইস্থলে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, শান্তিপুরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় দেশের এই ঊনবিংশ বৎসরের একমাত্র সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানটি মিউনিসিপ্যালিটির নিকট যে সাহায্য

পায়, তাহা নিতান্তই নগণ্য। এই সাহায্যটুকুও অনেক চেষ্টা করিয়া মঞ্জুর করিতে হইয়াছিল। যে দেশ একদিন সাহিত্য সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল, যে দেশ একদিন সাহিত্যিক-সমাজের তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল,—সেই দেশের এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানটিকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার নিমিত্ত আমরা দেশের জন-প্রতিনিধি সহৃদয় মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

| আয়— | | ব্যয়— | |
|---|---|---|---|
| মাসিকচাঁদা | ৬৪৲ | সভা বাবদ | ৫৷৵১ |
| প্রবেশ-চাঁদা | ১৸৹ | পুস্তক খরিদ | ১৯৸৵৹ |
| গচ্ছিত | ৩৲ | পুস্তক বাঁধাই | ১৩৷৵৹ |
| এককালীনদান | ২১৷৷৶৹ | গৃহভাড়া | ২৬৲ |
| ভিক্ষাসংগ্রহ | ৪৷৷১৹ | মুদ্রণ বাবদ | ৬৩৷৷৹ |
| 'বার্ষিকী' বিক্রয় | ৮৲ | আসবাবপত্র | ১০৲ |
| মিউনিসিপ্যাল সাহায্য | ১১৲ | 'শান্তিপুর' মাসিকপত্রের | |
| কর্জ্জ জমা | ৬১৲ | প্রেসের দেনা শোধ | ১২৲ |
| | ১৭৪৸৶১০ | আংশিক কর্জ্জশোধ | ১১৲ |
| ১৮শ বর্ষের জের | ১২৭৲১৫ | বিহারের ভূকম্প-পীড়িত- | |
| | | দের সাহায্য | ৫৷৷৶৹ |
| মোট আয় | ৩০১৸৵৫ | মিশ্র | ৬৷৷৶১০ |
| বাদ ব্যয় | ১৭৪৶৹ | | |
| | | | ১৭৪৶১০ |
| মজুত | ১২৭৸৵৫ | | |

মজুতের জায়—

| | |
|---|---|
| পোঃ অঃ সেভিংস ব্যাঙ্কে | ১২৫৷৶১৫ |
| সম্পাদকের হস্তে | ২৷৶১০ |
| মোট | ১২৭৸৵৫ |

হিসাব যথোচিত পরীক্ষা করিয়াছি ; উহা নির্ভুল আছে।

তাং ৫।৭।৪১ ( স্বাক্ষর ) শ্রীবিমলেন্দু পাল

হিসাবপরিদর্শক।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি—১৯শ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, এম্-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন।

সহঃ সভাপতি — গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন।

সম্পাদক— প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

সহঃ সম্পাদক — „ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।
„ নির্ম্মলচন্দ্র প্রামাণিক।

গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীমান্ অবনীমোহন প্রামাণিক।

সহঃ গ্রন্থাধ্যক্ষ — বিমলাকান্ত দালাল।
„ সীতানাথ দাশ।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য—

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ভবানী।
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামাণিক।
„ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ ডাঃ রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, এম্-বি।
„ চণ্ডীচরণ দে।
„ সুরেন্দ্রকুমার ভবানী।
„ অমৃতলাল প্রামাণিক, বি-এস-সি।
„ লক্ষ্মীকান্ত দালাল।
„ রবীন্দ্রগোপাল প্রামাণিক।
„ রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল।
„ সুধীরঞ্জন প্রামাণিক।

হিসাবপরিদর্শক—শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু পাল, এম-এ।

**পূর্ণিমা সম্মিলন**—আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ভাবে মাসিক অধিবেশন "পূর্ণিমা সম্মিলন" অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি মাসের শুভ পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যার সময় এই অধিবেশন হইয়া থাকে। নিম্নে পূর্ণিমা সম্মিলনের বিবরণ প্রদত্ত হইল—

**১ম অধিবেশন**—১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন। পঠিত প্রবন্ধাদি :—"জন্মভূমি-মা" (কবিতা)—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক। "শ্রী শ্রী৺লোহাজাঙ্গি ঠাকুর ও গঙ্গা-প্রবাহ" (প্রবন্ধ)—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল। "রাসোৎসব" (কবিতা)—শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন। "হরির সাহস" (কবিতা)—শ্রীরাসবিহারী প্রামাণিক। "সতীর মৃত্যু" (গদ্যকাব্য)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। "টাকা-মাহাত্ম্য" (কবিতা)—শ্রীভোলানাথ প্রামাণিক, বাণীকণ্ঠ। "লাঞ্ছিতা" (কবিতা)—শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দালাল। "একটি পিতৃমাতৃহীন মেয়ের প্রতি" (কবিতা)—শ্রীসত্যরঞ্জন দাশ।

**২য় অধিবেশন**—১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন। পঠিত প্রবন্ধাদি :—"দ্বন্দ" (কবিতা) —শ্রীগৌরচন্দ্র পাল। "পল্লীব্যথা" (আলোচনা)—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র প্রামাণিক। "মেঘদূত" (কবিতা)—শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন। "পুরাণ" (কবিতা) —শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। "মুক্তি" (কবিতা)—শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দালাল। "দুর্দ্দিনের যাত্রা" (গান)—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

**৩য় অধিবেশন**—১৬ই পৌষ, ১৩৪০। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন। পঠিত প্রবন্ধাদি :—"সুপ্রভাত" (কবিতা)—শ্রীঅভয়াচরণ পাল। "বর্ত্তমান শিক্ষার এক দিক" (প্রবন্ধ) —শ্রীঈশানচন্দ্র সরকার। "অমানিশা" (কবিতা)—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বিশ্বাস। "বিদায়" (কবিতা)—শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দালাল। "গান" (গান) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ

বিশ্বাস। "কোকিল" (কবিতা)—শ্রীগোরচন্দ্র পাল। "শীতের রাতে" (কবিতা)—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

**৪র্থ অধিবেশন**—১৬ই মাঘ, ১৩৪০। সভাপতি—শ্রীযুক্ত অজিত-কুমার স্মৃতিরত্ন। পঠিত প্রবন্ধাদি :—"শীতের প্রাতে" (কবিতা) শ্রীপ্রভাস-চন্দ্র প্রামাণিক। "বাঙ্গলার চিনিশিল্প" (প্রবন্ধ)—শ্রীঈশানচন্দ্র সরকার। "রুদ্রনর্ত্তন" (কবিতা)—শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন। "আশা" (কবিতা)—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বিশ্বাস। "গান" (গান)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। "প্রাচীন বঙ্গের মহিলা-সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি" (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

**৫ম অধিবেশন**—১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪০। সভাপতি শ্রীযুক্ত অজিত-কুমার স্মৃতিরত্ন। পঠিত প্রবন্ধাদি :—"ফাগুন রাতের চাঁদ" (কবিতা)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। "যম বা মহাকাল" (কবিতা)—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বিশ্বাস। "দোলযাত্রা" (কবিতা)—শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন। "দোল" (কবিতা)—শ্রীভোলানাথ প্রামাণিক, বাণীকণ্ঠ।

**৬ষ্ঠ অধিবেশন**—১৬ই চৈত্র, ১৩৪০। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন। পঠিত প্রবন্ধাদি :—"গান" (গান)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। "লুকোচুরি" (প্রবন্ধ)—শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন। "৺বীর আশানন্দ" (প্রবন্ধ)—শ্রীচণ্ডীচরণ দে; "সুপ্রভাত" (কবিতা)—শ্রীসত্যরঞ্জন দাশ।

**৭ম অধিবেশন**—১৩ই বৈশাখ, ১৩৪১। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন। পঠিত প্রবন্ধাদি :—"সন্ধ্যা" (কবিতা)—শ্রীঅবনীমোহন প্রামাণিক। "বিদায়ের পূর্ব্বে" (কবিতা)—শ্রীসত্যরঞ্জন দাশ। "সুন্দর" (কবিতা)—শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দালাল। "আলেয়া"

(কবিতা)—শ্রীগৌরচন্দ্র পাল। "দুঃখের কথা" ( কবিতা )—শ্রীরাসবিহারী প্রামাণিক। "নমস্কার" ( কবিতা )—শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ। "বসন্ত এসেছে আজ ফাগুনের প্রাতে' গান )—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

**৮ম অধিবেশন**—১৪ জৈষ্ঠ, ১৩৪১ সভাপতি—শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পঠিত প্রবন্ধাদি :—"চলার গান" ( কবিতা — শ্রীগৌরচন্দ্র পাল। "মেয়ের দুই একটি কবিতা"। প্রবন্ধ —শ্রীনির্মলচন্দ্র প্রামাণিক "ধরিকর" ( কবিতা )—শ্রীঅবনীমোহন প্রামাণিক "আমি" ( কবিতা )—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

**৯ম অধিবেশন** ১১ই আষাঢ় ১৩৪১। সভাপতি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পঠিত প্রবন্ধাদি :—"দেশ" ( কবিতা )—শ্রীগৌরচন্দ্র পাল। "শান্তিপুরের শ্রমিক" ( প্রবন্ধ )—শ্রীঈশানচন্দ্র সরকার।

**১০ম অধিবেশন** -৯ই শ্রাবণ, ১৩৪১। সভাপতি- শ্রীযুক্ত অজিত কুমার স্মৃতিরত্ন পঠিত প্রবন্ধাদি: "চাষার আশা" ( কবিতা )— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক। "ঋণ পরিশোধ"। গল্প। শ্রীফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। "গান" ( গান ) - শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। 'স্বখাদ-সলিল" ( কবিতা ) শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন। 'এর চেয়ে বেশী কিছু নয়" ( কবিতা )- শ্রীনবিনকুমার লাহিড়ী, এম-এ। কবিকঙ্কণ-কাব্যে বাঙ্গলার বাহির্বাণিজ্য বিস্তার" ( প্রবন্ধ ) - শ্রী প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

**১১শ অধিবেশন** ৭ই ভাদ্র ১৩৪১। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন। পঠিত প্রবন্ধাদি :—"গ্রামের পথের ধারে"। কবিতা )—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। "তরুণ"। কবিতা )— শ্রীঅবনী-মোহন প্রামাণিক "পাড় পাড়" ( কবিতা ) শ্রীফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ' স্বভাবকবি সাধক-কবি কৃষ্ণচন্দ্র" ( প্রবন্ধ ) - শ্রী প্রভাস চন্দ্র প্রামাণিক

১২শ অধিবেশন—৫ই আশ্বিন, ১৩৪১। সভাপতি— শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন। পঠিত প্রবন্ধাদি:—"বোধন" (গান)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। "শারদোৎসব" (কবিতা) শ্রীগৌরচন্দ্র পাল। "ঠাকুর হরিদাস" (প্রবন্ধ)—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র প্রামাণিক। 'শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মচরিত" (প্রবন্ধ)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। "পূর্ব্বাপর" (কবিতা)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। 'শরচ্চন্দ্র" (কবিতা)—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু। "গৌরচন্দ্র" (গীত)—শ্রীবিহারীলাল প্রামাণিক

পরিষদের ১৯শ বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ শেষ হইল। যে সমস্ত সহৃদয় ব্যক্তি পরিষদকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া ইহার পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিয়াছেন—তাঁহাদের প্রত্যেককে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে সকল কর্ম্মী, সেবক ও ছাত্রবন্ধু সময় ও শক্তি দিয়া সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—তাঁহাদিগকেও আমরা প্রীতি-অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শান্তিপুরের মত ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থানের সাহিত্য পরিষদের অনেক কিছু করিবার আছে। কিন্তু তাহার জন্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্য সহানুভূতি বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। আমরা শক্তিহীন, পরিষদকে বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর বাণীমন্দিরে পরিণত করিতে পারি—এ ক্ষমতা আমাদের নাই; পরিষদকে শান্তিপুরবাসী সুধীজনই গড়িয়া তুলুন—ইহাই নিবেদন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক
সম্পাদক।

Printer L M Ray
LALIT PRESS
*81, Simla Street, Calcutta.*
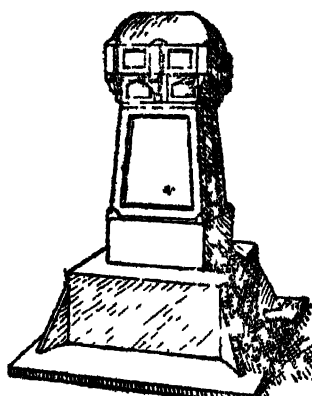
আশানন্দ স্মৃতিস্তম্ভ

শান্তিপুরের বীরসন্তান ৺আশানন্দ মুখোপাধ্যায় ( 'ঢেঁকি' ) মহাশয়ের নাম বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইঁহার অসীম দৈহিক বল এবং দুষ্টের উপর তাহা প্রয়োগের নানা কাহিনী আজও দেশবিদেশে শুনিতে পাওয়া যায়। শুধু দৈহিক শক্তিশালী নন, ইনি দয়ালু, ক্ষমাশীল, পরোপকারী, উদারপ্রাণ ও চরিত্রবান মহাপুরুষ ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি দেশের সম্মুখে উজ্জ্বল রাখিবার জন্য ইঁহার ঠাকুরবাড়ী-প্রাঙ্গণে "আশানন্দ-স্মৃতিস্তম্ভ" নামে একটি মনোরম স্তম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। স্তম্ভটির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে, কিন্তু আর্থিক অনটন বশতঃ ইহার চারিদিকে রেলিং বা প্রাচীর ইত্যাদি এখনো দেওয়া যায় নাই। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য 'আশানন্দ-স্মৃতিস্তম্ভ-সঙ্ঘ' দেশবাসীর নিকট কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রদ্ধার সহিত যিনি যাহা দান করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং উক্ত শুভকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। সাহায্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, আশানন্দ-স্মৃতিস্তম্ভ সঙ্ঘের কোষাধ্যক্ষ, আশানন্দপল্লী, পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া।